KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫ খেলাতবাবু লেন, [illegible], কল-৩৭
Collection KLMLGK	Publisher সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
Title অন্তরীপ (Antareep)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number ? (Annual No) ? (Annual No) ? (Annual No) ? (Annual No)	Year of Publication : NOV 1992 OCt 1993 Jun 1994 Jun 1997
	Condition : Brittle Good ✓
Editor সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়	Remarks

C.D. Roll No KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্তরীপ
নভেম্বর ১৯৯২

# গল্প

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্তরীপ
নভেম্বর ১৯৯২

## প্রবন্ধ

৩—২৩ সময়, সাধারণ ও ব্যক্তিগত
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা প্রসঙ্গে নিখিলেশ গুহ
২৪—৩৬ নাগরিক মন ও বাংলা কবিতা ঃ পঞ্চাশ ষাট সত্তর নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
৫৭—৬৭ তৃণমূল থেকে কবিতা সুবোধ সরকার
৬৮—৮০ কবিতার বিদেশীবিভূই সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

## কবিতা

৩৭—৫৫ অমিতাভ গুপ্ত প্রমোদ বসু সব্যসাচী দেব সংযম পাল
ব্রত চক্রবর্তী রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণা বসু
বিপুল চক্রবর্তী মৌ দাশগুপ্ত অমিতাভ মিত্র গৌতম দাস
পিনাকী ঠাকুর সুদীপ গঙ্গোপাধ্যায় নাসের হোসেন দিলীপ ভট্টাচার্য
পৌলমী সেনগুপ্ত কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় শবরী ঘোষ
অরূপ আচার্য জহর সেনমজুমদার নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়
পিনাকী ঘোষ অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় চৈতালী চট্টোপাধ্যায়
অমিত আদক অর্ণব সাহা রুদ্র পতি সব্যসাচী সরকার
শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

## অন্যভাষার কবিতা

৮১—১৪১ কেদারনাথ সিং কে. সচ্চিদানন্দন নবকান্ত বড়ুয়া রমাকান্ত রথ
আসিক হানাফি হাবিব জালিব গোজো ইয়োশিমাসু ইয়ং লুই হং
ডেনিস ব্রুটাস গ্যাব্রিয়েল ওকারা মিলোশ্লাভ হোলুব টিয়াস
ফিলিপ জাকোতে আন্দ্রেই ভজনেসেন্স্কি ন্যান্সি মোরজন
হোসে এমিলিও পাচেকো জুডিথ্ রড্রিগজ্ ভার্জিনিয়া আর. টেরিস
মাক্সিন কুমিন লুই সিম্পসন

## অনুবাদক

মণীন্দ্র গুপ্ত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত রঞ্জিত সিংহ
দেবতোষ বসু দেবারতি মিত্র আনন্দ ঘোষহাজরা অমিতাভ গুপ্ত
তুষার চৌধুরী অরণি বসু সুজিত সরকার সমীরণ মজুমদার
মল্লিকা সেনগুপ্ত চৈতালী চট্টোপাধ্যায় শবরী ঘোষ
পৌলমী সেনগুপ্ত শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদনা সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

## প্রসঙ্গত

বিদেশী ও ভারতীয় কবিতার অনুবাদে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হল 'অন্তরীপ'-এর এই সংখ্যা। পরিকল্পনা ছিল ভাষান্তরে কবিতার একটি সম্পূর্ণাঙ্গ চালচিত্র তুলে ধরার ঃ কিভাবে এই মুহূর্তে ৬টি মহাদেশে চর্চিত হচ্ছে কবিতার নিরীক্ষা, কোন্ পথে আজকে বাঁক নিচ্ছেন ভারতীয় বিভিন্নভাষী কবির দল। যোগ্যজনের তর্জমাগুলি থেকে উঠে এল সেই ছবি, একজোটে অনূদিত হলেন ২০ জন জীবিত ও প্রতিষ্ঠ কবি তাঁদের ৭০টি কবিতার নিরিখে। এই সময়ের উত্তাপে ধরা রইল তাঁদের উচ্চারণ আর আঙ্গিক।

এই প্রজন্মের ৩০টি কবিতাও রইল এর সঙ্গে।

এ ছাড়া, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাকৃতি মূল্যায়িত হল একটি বিশেষ সময়ের প্রেক্ষিতে। পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের কবিতায় নাগরিক মনস্কতা নিয়ে রইল একটি ভিন্নমেজাজী গদ্য। তৃণমূল থেকে যে জেগে উঠতে চাইছে আজকের কবিতার ভাষা, সে সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবনা সাজিয়ে দিলেন এই সময়ের একজন কবি তাঁর একটি মূল্যবান নিবন্ধে। কবিতার অনুবাদ্যতা নিয়ে সংযোজিত হল আরো একটি প্রবন্ধ।

ভাষান্তরেও যাঁরা কবিতার জন্য উন্মুখ, এ সংখ্যা নিবেদিত হল তাঁদের হাতে।

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

## সময়, সাধারণ ও ব্যক্তিগত

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা প্রসঙ্গে

নিখিলেশ গুহ

সময় তো জানোই
নয় ব্যাকরণের অব্যয়।
যখন সে পদে থাকে
সেইমতো আকার।
সময়ের সঙ্গে আমরা সম্বন্ধ পাতাই
ছোটো, বড়, গোল, চৌকো নানান মাপের।
সময়টা এক নয়—
এর ওর তার।
তোমার সময় দিয়ে তাই
বৃথা চেষ্টা আমাকে মাপবার।

( 'কাল মধুমাস' )

স্থান-কাল-পরিবেশ আমাদের চৈতন্য নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু নিজেদের মতো ক'রে আমরা সময়কে কতটা পাই? 'জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে / চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়।' এরকম ভেদরেখা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে একজন বাঙালি কবি ( সমর সেন ) টেনেছিলেন। বাস্তবে এমন হয়? বস্তুজগৎ এবং চৈতন্যলোক পরস্পরের ওপর ছাপ রাখছে না?

কবিতা আলোচনার শুরুতে দর্শনের কচকচি কেন? কারণ কবির রচনায় কাল যেভাবে ধরা পড়ে, স্থূলদৃষ্টিতে তার রূপ সবসময় সেভাবে ধরা পড়ে না। ঘটনার মর্মমূলে যিনি পৌঁছতে পারেন, তাঁর কাছে 'সংবাদ মূলত কাব্য'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অগ্রজ এক বাঙালি কবি ( বিষ্ণু দে ) তাঁর গোধূলিবেলায় এক কবিতা সংকলনের এই নাম রেখেছিলেন। স্থানান্তরিত করে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বিষয় পরিচয়ে নামটির ব্যবহার অযৌক্তিক হবে না। বিকল্পে 'পদাতিক'—তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের অভিধায় তাঁর পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যকর্ম চেনানো যেতে পারে। 'যেতে যেতে / রাস্তা থেকে / কিছুর ভেতরে কিছু / নয় যেন। এমনি ক'রে জানো—' মধ্য বয়সের এক অপ্রধান কবিতায় ( 'সফরী' / "ছেলে গেছে বনে" ) তিনি নিজেকে বলেছিলেন। "ক্ষণিকা"-য় রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেছিলেন, বলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তীকালের অনুজ অপর এক কবিও,

থাকব না ভাই, থাকব না কেউ—
থাকবে না ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে চলে
কালের পিছু পিছু।

—রবীন্দ্রনাথ

যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই, বিচার-বিশ্লেষণ তোমার নয়
তোমার নয় কূটকচাল, টানাপোড়েন, সার্বজনীন মৌতাত, রাধেশ্যাম
যাত্রী তুমি—পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই।

—শক্তি চট্টোপাধ্যায়

( 'যেতে যেতে' / "সোনার মাছি খুন করেছি" )

বাচ্যার্থ এক কিন্তু প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন, ভিন্ন দর্শনও। যে রাজনৈতিক মতবাদ অবলম্বন ক'রে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কবিতায় প্রথম পা রাখেন, তা ঊনিশ শতকের সমাজ সংস্কারের আদর্শে গঠিত নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুবসমাজের উড়োনচণ্ডীপনা থেকে সমান দূরে। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বলে তার আখ্যা দেওয়া হয়েছে—কতখানি বৈজ্ঞানিক সে সম্পর্কে অবশ্য পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। বর্তমানে আমাদের পক্ষে যা প্রাসঙ্গিক তা হ'লো, পূর্ববর্ণিত পদাতিক চরিত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাকে কতখানি গঠন করেছে। উত্তরে বিষয় এবং শৈলী দুদিকেই জোর দেওয়া উচিত। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ভাব এবং আঙ্গিক পরস্পর সম্পর্কিত হলেও, বিচারে দুয়ের ওপর প্রায়ই সমান গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। বিশেষত একটি প্রবন্ধের নির্দিষ্ট পরিসরে। বাংলা কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব সমঝদার মহলে চমকপ্রদ হয়ে উঠেছিল অনেকখানি আঙ্গিকের নৈপুণ্যের কারণে। বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসার ভাষায় 'বলাকৌশলে তাঁর ( সুভাষের ) দখল এতই অসামান্য যে কাব্যরচনায় তাঁর চেয়ে ঢের বেশী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এই ক্ষুদ্র বইখানায় শিক্ষণীয় বস্তু আছে ব'লে মনে করি।' আঙ্গিককৌশল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার সাফল্যের মূলধন। এমনকি আঙ্গিকে তিনি আমাদের চোখ ভোলান, অন্তরসম্পদে নয়—বিরুদ্ধবাদীদের কণ্ঠে এমন বক্তব্যও শোনা গেছে। বর্তমানে এই তর্কের কূটকচালিতে প্রবেশের সময় আমাদের নেই। কারণ তাঁর আঙ্গিকগত মুন্সিয়ানার লোভনীয় আলোচনা অপেক্ষা আমাদের অধিক আকর্ষণ করছে অন্য এক বিষয়—সমালোচকরা যার প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দান করেননি।



"যত দূরেই যাই", যে কাব্যগ্রন্থের জন্য অতীতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার লাভ, থেকে এবছর তাঁকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার নির্বাচকমন্ডলী সম্মান জানাতে এগিয়ে এসেছেন তাঁর যে পর্যায়ের কাব্যকৃতির বিচারে ( ১৯৭১-৭৬ )—আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকবে। তবে প্রয়োজনে কবির রচনার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী অংশের প্রতিও আমাদের তাকাতে হবে।

২

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের কবিতাপ্রসঙ্গে যে কোন আলোচনায় নজরুল, সমর সেন বা সুকান্তর নাম অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাংলা কবিতার সাম্যবাদী ধারা প্রথম এদেরই যত্নে প্রবাহিত হয়। নজরুলের বোহিমীয় চরিত্র এবং পল্টন অভিজ্ঞতা তাঁকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু নিয়ন্ত্রণহীন আবেগ তাঁর ব্যক্তি জীবনের পরিণাম যেমন শোচনীয় করে তুলেছিল, সেরকম তাঁর কবিতাকেও দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াতে দেয়নি। আরবী, ফারসী শব্দের আমদানী তাঁর কবিতায় ধ্বনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলেও কবিতার মূল উপাদানগুলি যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আহরণ করেছিলেন, তা আড়ালে থাকেনি। অপরদিকে যে রাজনৈতিক মতবাদ বুকে ধারণ করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর যাত্রা শুরু করেন, বাংলাদেশে তার প্রবক্তারা রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল্যায়ন বিষয়ে দীর্ঘকাল মনস্থির করতে পারেননি। নাগরিক সপ্রতিভতাও সুভাষকে রোমান্টিকতায় মজতে দেয়নি। বিষ্ণু দে বা সমর সেনের মতো রবীন্দ্রনাথের পঙ্‌ক্তি বিশেষ নিজের রচনায় খেলিয়ে নেবার সাধও তাঁর মধ্যে কখনও দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোনো স্মরণীয় শ্রদ্ধার্ঘ আজ পর্যন্ত তাঁর কলম থেকে জন্মলাভ করেনি। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি প্রবেশ করার পূর্বেই অবশ্য ত্রিশ দশকের অগ্রণী কবিরা ( সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে ) আধুনিক কবিতা রচনার উন্নত মান বাংলাভাষায় স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বুর্জোয়া সমাজের অসঙ্গতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে প্রকাশ করায় সমর সেনের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আশ্চর্য মিল। সেকালে কম্যুনিষ্ট পার্টি মহল এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করে সর্বদা যে খুব প্রীত হয়েছিল তা নয়। উদাহরণত ১৯৪০ সালে কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত "আধুনিক বাংলা কবিতা" নামক সংকলন গ্রন্থের মুখবন্ধে অন্যতম সম্পাদক হিসেবে কম্যুনিষ্ট নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ( এই কাব্যকোষের অপর সম্পাদক ছিলেন বিপরীত মেরুর মানসিকতাসম্পন্ন সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব ) বলেন ঃ

'পুরনো পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ার আগে সে পৃথিবীকে গণশক্তিবলে ধ্বংস করার ঔচিত্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্তি তার ( সমর সেনের ) বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখায়

যেন পাওয়া যায় না। বিপ্লবী মনোভাবকে আত্মস্থ না করাতে তাদের কবিক্ষমতা কি ত্রিশঙ্কু রাজ্যেরই প্রতিভূ হয়ে থাকবে? সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখার সারগুণ সত্ত্বেও দেখা যায় যে অনেক সময় তাঁদের কাব্যপ্রসঙ্গ ও প্রকরণের সঙ্গে বিপ্লবী সিদ্ধান্তের সঙ্গতি নেই, সে সিদ্ধান্তকে ক্রোড়পত্র করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।'

রাজনৈতিক মতপার্থক্যের দরুণ যে সব পার্টি কর্মী এবং অতীতদিনের বন্ধুদের থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বর্তমানে বিচ্ছিন্ন, তারা ওপরে উদ্ধৃত অংশটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে গ্রহণ করলেও করতে পারেন। কিন্তু সন্দেহ নেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিংশতি পার্টি কংগ্রেস (১৯৫৬) পর্যন্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী রূপেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তারে এই পর্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে চড়াগলায় সুর ভাজার চেষ্টা যে সর্বত্র সফল হয়নি 'অগ্নিকোণ' কবিতাটি তার প্রমাণ। কবিতায় গলা যতদূর সম্ভব তুলে তিনি এখানে হাঁক পেড়েছেন, অনুভূতির আলোক বিচ্ছুরণ—শিল্পে যা আমাদের প্রত্যাশা—ঘটেনি। কবিতার অভিপ্রেত আবেদন যে এইভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় অবশ্য তা অল্পকালের মধ্যে বুঝেছিলেন। এবং বুঝেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে দিয়েন বিয়েন ফু বা পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন বিরোধী সংগ্রাম বর্ণনায় আমরা দেখি তিনি কিভাবে বাকসংযম আশ্রয় করেন।

মরুভূমির কড়াইতে টগবগ
টগবগ করছে
ফুটন্ত তেল—
ভাগ্যে!

রবারের বনে ঝুলছে
দড়ির ফাঁস।
পালাও ('ঘোড়ার চাল' / "যত দূরেই যাই")

সমর সেন বা সুকান্তর কাব্য প্রতিভার উন্মেষ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বের ঘটনা। প্রথম জনের কাব্যচর্চার মেয়াদ সীমিত। ফসল মিতপরিমাণ এবং চলন প্রধানত গদ্যের নিয়মানুসারে বাঁধা। অকালমৃত্যু কেড়ে নিয়ে যায় অন্যজনকে। ইতিহাসের বিশেষ পর্বে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাদের রচনাসাদৃশ্য দেখা গেলেও সুদীর্ঘ সময় তাদের একত্রে যাত্রা করা সম্ভব হয়নি। সমাজতন্ত্রের আরোহী-অবরোহী পর্বে ছন্দ নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাই একক দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন।



সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিষ্ণু দে-র কাব্যানুরাগীরা তাদের প্রিয় মহৎ কবির সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তুলনা এই প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করবেন। দুজনের পার্থক্য চিহ্নিত করতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য : 'একজনের জগৎটাই ছিল নিজস্ব নিভৃত জগৎ, আরেকজনের জগৎ এবং জীবন একাকার' (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাংলা কবিতার রূপান্তর" দ্রষ্টব্য)।

'ঘোড়সওয়ার' এবং 'পদাতিক' যথাক্রমে বিষ্ণু দে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দুটি বিখ্যাত কবিতার নাম। শব্দ দুটি যে ব্যঞ্জনা বহন করে তা কাজে লাগিয়ে উভয়ের তুলনা টানা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তি আবির্ভাবের পূর্বে ভূপৃষ্ঠে ঘোড়া ছিল স্থলভাগে দ্রুত যোগাযোগের অন্যতম বাহন। গতি ও শক্তির প্রতীকে বস্তুত তা পরিণত হয় আমাদের কল্পনায়। পেগেশাস বা পক্ষীরাজ—যত ভিন্ন নামেই অভিহিত হোক না কেন, উপযোগিতার স্তর থেকে ঘোড়া যে আমাদের কল্পনারাজ্যের সঙ্গী হয়েছে সেকথা অনস্বীকার্য। প্রাণের গতিময়তা বোঝাতেই বিষ্ণু দে-র কবিতায় ঘোড়ার উল্লেখ ঘটেছে। স্বয়ং 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটিতে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার আলোকে রিরংসার প্রতীক খুঁজে পেয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। সমুদ্রস্রোত নেমে যাওয়ার পরে চোরাবালির বিস্তৃতি এবং তার ওপর দোল-উৎসবের পূর্বরাত্রির অনুষ্ঠান উদযাপন ('চাঁচর'), ভেদশক্তিসম্পন্ন আয়ুধের প্রয়োগ ('বর্শা', 'বল্লম'), অর্গলমোচনের ডাক—'কাঁপে তনুবায়ু থরোথরো / কামনার টানে সংহত গ্লেসিয়ার'—প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি এবং শেষ পর্যন্ত অতৃপ্ত কামনার প্রকাশ—যেহেতু কবিতায় ঘোড়া 'বৈতরণীর পার' এবং 'পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে / আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে'—এই ধরণের ব্যাখ্যার সম্ভাব্য কারণ হিসাবে হয়তো অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু "চোরাবালি"র পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে ঘোড়ার উল্লেখ ভিন্নমাত্রা বহন করে এনেছে। নিচের উদাহরণগুলি তার প্রমাণ

ঘোড়া কেন বলো নাচে হ্রেষাচঞ্চল
নাসাপুট উদ্ধত?
সে কোন পাহাড়ে চলেছে, নীলকমল
বলো কি তোমার ব্রত?

চলেছে উধাও নক্ষত্ররা যত
বিদ্যুতে পাখা লীন
পিছু পিছু ধাও ধূলায় ওষ্ঠাগত
পক্ষীরাজ তুহিন
('বৈকালী-২' / "পূর্বলেখ")

আকাশে বাতাসে ঘুরুক গুপ্তচর
তাই কি পক্ষীরাজের থামবে ওড়া?
মাঠে বাটে ঘোরে বরকন্দাজ শত
তাই থমকাবে তোমার প্রাণের ঘোড়া?

খোলোনি খোলেনা তোমার ঘোড়ার খুর
প্রাণে ইস্পাতে পিটানো সে অভিযান
তোমার বাহুতে ভীরু বন্ধুর
দেশে দুর্জয় গরজায় জয়গান
('ছড়া : লাল তারা' / "সন্দ্বীপের চর")

কোথা কুমার ? পক্ষীরাজের
হ্রেষায় কবে ঘুমের দেশে
জাগাবে প্রাণ, সেই আওয়াজের
আভাস এসে হাওয়ায় ভেসে

( 'অবিচ্ছিন্ন কাব্য' / "অন্বিষ্ট" )

ঘোড়সওয়ার—'দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী' ঘোড়সওয়ার—যেমন আমাদের মনে দূরপথ অতিক্রমের এবং দুঃসাহসী অভিযানের অনুষঙ্গ জাগিয়ে তোলে, সেরকম বিষ্ণু দের কবিতা আমাদের দেশকালের বিস্তৃতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ভৌগোলিক নামের সমাবেশ এবং সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞতার উল্লেখ, তাই তাঁর রচনারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। 'পদাতিক' শব্দটি অপরদিকে বহন করে অনভিজাত পরিচয়, পথচলতি মানুষের স্রোত থেকে আলাদা করে যা ভাবা যায় না। "পদাতিক" কাব্যগ্রন্থে সুভাষ বলেছেন

আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি
একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে ;
আপাতত চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি
শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ চিনে। ( 'সকলের গান' )

একসাথে চলার ইচ্ছাপ্রকাশের সাথে সাথে চলার পথের অভিজ্ঞতা যে ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিককার কবিতায় সে সত্য ধরা পড়ে না। মার্ক্সীয় সাহিত্য বিচার তখনো এদেশে-বিদেশে শিল্পকর্মকে নিজস্ব মূল্যে বিচার না ক'রে সামাজিক অবস্থানের মাপকাঠিতে মূল্যায়নে ব্যস্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কবি হবেন সমাজে 'প্রগতিশীল' অংশের মুখপাত্র ; সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সর্বদা লেখনী ধারণ করবেন। পঞ্চাশ দশকের শেষ পর্যন্ত এই প্রত্যয় থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সৃষ্টি। তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতের সঙ্গে ইতিমধ্যে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে তাঁর পরিচয় ঘটে। বাঙালী কবিতা পাঠকের সঙ্গে তুরস্কের এই কবি প্রতিভার পরিচয় ঘটাতে গিয়ে তিনি হিকমতের কতগুলি উক্তি "নাজিম হিকমতের কবিতা"র মুখবন্ধে স্থাপন করেছেন যা তার নিজের বিশ্বাসের জমিকে চিহ্নিত করে।

'কবিতায় গদ্যের আর কথা বলবার ভাষার ভিন্নতা নতুন কবি স্বীকার করেন না। এমন এক ভাষায় তিনি লেখেন যা বানানো নয়, কৃত্রিম নয়, সহজ প্রাণবন্ত বিচিত্র, গভীর,



একান্ত জটিল অর্থাৎ অনাড়ম্বর সেই ভাষা। সে ভাষায় উপস্থিত থাকে জীবনের সমস্ত উপাদান। কবি যখন লেখেন আর যখন কথা বলেন কিংবা অস্ত্র হাতে নেন তিনি একই ব্যক্তি। কবিরা তো আকাশ থেকে পড়েননি যে তাঁরা মেঘের রাজ্যে পাখা মেলবার স্বপ্ন দেখবেন ; কবিরা হলেন সমাজের একজন—জীবনের সঙ্গে যুক্ত। জীবনের সংগঠক।'

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী লেখক জীবনে এই প্রভাব কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছিল অশ্রুকুমার সিকদার ইতিমধ্যেই তা আলোচনা করেছেন ( "আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়" গ্রন্থে। ) "ফুল ফুটুক" কাব্য সংকলনে এই প্রভাব সবচেয়ে ফুটে উঠেছে—সমালোচকের সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা একমত। কিন্তু "ফুল ফুটুক" সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার একপর্বের সমাপ্তি।

পরবর্তী গ্রন্থ 'যত দূরেই যাই' শুরুতেই অন্যসুরে বাঁধা। সকলের জন্য জীবন-যাপন করার পরেও কবির নিজের জন্য কিছুটা সময় সংরক্ষিত। কেবল কবি নয়, সব মানুষের-ই যে নিজস্ব সময়ের মূল্য আছে—"কাল মধুমাস" গ্রন্থের নাম কবিতার অংশ বিশেষে যার স্বীকৃতি উদ্ধার ক'রে বর্তমান আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আর এক বিখ্যাত কবিতার চিন্তায় স্থান পেয়েছে। 'যত দূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থের শুরুতেই এর স্থান। সময় এবং নদীস্রোতের তুলনা কিংবা ব্যক্তিমানুষের জন্য এ দুই অপেক্ষা করে না—ইত্যাদি উক্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি জীবনের শুরুর পর্যায়ে আরেক বাঙালী কবির মন্তব্যও কিছুতেই ভোলা সম্ভব নয়— 'বস্তুত জোয়ারে / ততটাই ফিরে আসি, যতখানি এগোই ভাঁটাতে।' ( 'জেসন', সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ) কিন্তু নদীপ্রবাহ স'রে গেলেও সময়-সময় আমাদের ছেড়ে যায় না। 'For at my back I always hear / Time's winged chariot hurrying near'—ইংরেজ কবি যেভাবে বলেন সেভাবে অবশ্য নয়। বরং রবীন্দ্রনাথ যেভাবে মৃত্যুর স্বর শুনেছিলেন ( "উৎসর্গ", ৪৫ নং কবিতা ),

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো এ কি প্রণয়েরি ধরণ।

সেভাবেই সময়কে গুঞ্জরিত হতে শোনেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়—

আমার কাঁধের ওপর হাত রাখল
সময়।

তারপর কানের কাছে
ফিসফিস করে বলল—
দেখলে !
কান্ডটা দেখলে !
আমি কিন্তু কক্ষনো
তোমাকে ছেড়ে থাকি না। ( 'যেতে যেতে' )

সময়ের সঙ্গে আত্মগত সংলাপের শুরু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় "যত দূরেই যাই" কাব্যগ্রন্থ থেকে। সাধারণের জন্য স্বীকৃত সময় থেকে পৃথক ক'রে ব্যক্তির বিশেষ সময় এবং সে পরিসরে পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা তার পরবর্তী রচনাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩

মিথ ব্যবহার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বৈশিষ্ট্য হিসেবে সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যেতে পারে। সন তারিখ অনুযায়ী আমরা ইতিহাসে ঘটনা বিশ্লেষণ করি। কিন্তু সময়ের শৃংখলে মিথ বাঁধা পড়ে না। মিথ কালাতীত এবং চিরন্তন। সময়ের হিসেব রাখার আগে কোন এক দূর অতীতে জাতির যূথচেতনা যখন সবে বিকাশলাভ করছে, মিথ-এর কাহিনী সংস্থাপিত। তবে তার তাৎপর্য কোনো বিশেষ কাল পরিধিতে আবদ্ধ নয়। যে বিশেষ পরিস্থিতিতে একবার তার কাহিনীভাগ রূপ নিয়েছে ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে তুলনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় বারবার। ফিরে ফিরে তাই মিথ প্রাসঙ্গিকতা পায়। অন্তত যে সমষ্টিগত চেতনা মিথের মাধ্যমে প্রকাশলাভ করে, তাতে যুক্ত সকলের-ই এই বিশ্বাস। মিথ আচরণীয় মূল্যমান নির্দিষ্ট করে।

আধুনিক বাংলা কবিতায় মিথের প্রয়োগ সবচেয়ে সফলভাবে যাঁরা ঘটিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব এবং বিষ্ণু দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভ্যতার অতীত ইতিহাসের প্রতি পর্যায়ের যা কিছু ইতিবাচক সাম্যবাদী সংস্কৃতি তার ঐতিহ্য প্রসারিত করবে, বর্তমানকালের প্রগতিশীল সমস্ত প্রবণতার সঙ্গে মিলিয়ে—মার্কসের এই নির্দেশ মান্য করলে—নতুন করে মিথের ব্যাখ্যা, কম্যুনিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মীকে ভাবতে হয়। বিষ্ণু দে সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর কবিতায় মিথের ব্যবহার অবশ্য মার্ক্সবাদে দীক্ষার পূর্বেই দেখা যায়। "চোরাবালি" গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে মন্তব্য করেছিলেন, আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠকমাত্রই তার সঙ্গে



পরিচিত : 'বিষ্ণু দে-র মতো এলিয়ট-ভক্ত কখনও নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না, ভাবাবেশের উপযোগী বহিরাশ্রয়ের সন্ধানে আধুনিক সংস্কৃতির দিগিন্দিক বেড়িয়ে আসেন।' প্রাচ্য পাশ্চাত্যের দূরতম অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সভ্যতার দিকচিহ্নগুলি বিষ্ণু দের কবিতায় বারবার যত উল্লিখিত হয়েছে আর কোন বাঙালী কবির রচনায় তা হয়নি। প্রত্ন-প্রীতির ফলেই যে এরূপ ঘটেছে তা নয়, অতীতের নব নব ব্যাখ্যা তিনি শোনান বর্তমানের চরিত্র নিরূপণের প্রয়োজনে। লোকসংস্কৃতির প্রতি স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয়। গ্রন্থের নাম রাখেন "সাত ভাই চম্পা" ( প্রকাশকাল ১৯৪৪ )। এই গ্রন্থের নাম কবিতার সঙ্গে একই বিষয়ে আরো পরে লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পারুল বোন' কবিতাটি তুলনা করা যেতে পারে। রচনা দুটির শুরু ও শেষ ভাগ নিচে উদ্ধৃত হলো।

চম্পা তোমার মায়ার অন্ত নেই,
কত না পারুল রাঙানো রাজকুমার
কত সমুদ্র কত নদী হয় পার।
বিরাট বাংলা দেশের কত না ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই—
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে।

* * *

কড়ির পাহাড়ে চম্পা, তুমি তো নেই
কাঞ্চনমালা জানে না তোমার খেই ;
তবুও তোমায় খুঁজে মরে সারা দেশ—
ঘেচাও চম্পা দুঃস্থ ছদ্মবেশ,
এ মাহ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে
চকিতে দেখাও জনগণমনে সুখ।
মুক্তি ! মুক্তি ! চিনি সে তীব্র সুখ
সাত ভাই জাগে, নন্দিত দেশ দেশ।
( 'সাত ভাই চম্পা' : বিষ্ণু দে )

অন্ধকার পিছিয়ে যায়
দেয়াল ভাঙে বাধার
সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল বোন আমার—
দেখি তো কে তোমায় পায়
বেড়ি পরায় আবার ?

* * *

শিকলে বাঁধে স্পর্দ্ধা কার ?
পারুল, বোন আমার।
কঁকিয়ে-ওঠা যন্ত্রণা নীল
আগুনে যাক পুড়ে
বাতাসে সব দুঃস্বপন
আকাশে যাক উড়ে।
শুয়ে শুয়ে দিন গুণছে
পারুল বোন আমার।
( 'পারুল বোন' : "ফুল ফুটুক" )

পদাতিক এবং অশ্বারোহীর তুলনায় আবার ফিরে আসি। ঘোড়ার খুরের নালে ঠিকরে-পড়া বিদ্যুতের মতো বিষ্ণু দে-র কবিতার উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গগুলি টগবগ ধ্বনির সঙ্গে দৃষ্টিপথে উঠে আসছে, কণ্ঠে যোজন-যোজন অতিক্রমের অভিক্ষেপ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়ার ছন্দ রাজপুত্রের হাতে তরোয়ালের মত ঝক্‌মক্‌ করছে, দৈত্যপুরী

থেকে যে একাই সাহসে ও বুদ্ধিবলে রাজকন্যাকে উদ্ধার করবে। কবিতায় লোককথা ব্যবহারের প্রবল দুটি দৃষ্টান্ত হিসাবে ওপরের উদাহরণ দুটি আমাদের মনে রাখা উচিত। "সাত ভাই চম্পা"-র পরবর্তী যে কাব্যগ্রন্থটি বিষ্ণু দে রচনা করেন "সন্দ্বীপের চর", সেখানেও একবার লোককথা থেকে গৃহীত এই আখ্যায়িকাটির সুপ্রয়োগ ঘটেছে—

জেগেছে চম্পা, সাতভাই ভাবি বসে।
তোমার কাহিনী ছেলেমেয়েদের চোখে
রটবে কেমন রাক্ষসে বর্গীতে
রূপকথা যেন, সে দিন কেই বা রোখে?
দেশের কপালে তুমি দিনেকের সাজা
সুয়োরাণী তুমি জানো না তোমার দুয়ো
জানো কি আমরা আসলে তোমারও রাজা
আমরাই সাতভাই। কাল তুমি ভুয়ো।— ('পারুলের ছড়া' / "সন্দ্বীপের চর")

"পূর্বলেখ" গ্রন্থের 'জন্মাষ্টমী' বিষ্ণু দে-র প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতাগুলির অন্যতম গণ্য করা হয়। জন্মাষ্টমীর তাৎপর্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্মরণ করেছেন "একটু পা চালিয়ে ভাই" কাব্যগ্রন্থে। তার জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তির পর কলকাতা দূরদর্শন গৃহীত এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে নিজের যে দু-তিনটি রচনা তিনি পাঠ করেন তার একটি হলো 'সাধ'। নীচের পঙ্‌ক্তিগুলি তার থেকে গৃহীত।

বাইরে চলে সারাক্ষণ অক্লান্ত বর্ষণ
থেকে থেকে চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ
জন্মাষ্টমীর মত অন্ধকার
এই আলো-নেভানো শহরে।

কংসের কারাগারে বিপর্যয়ের রাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ('পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় দুর্জনানাং ধর্মসংস্থাপনায় চ সম্ভবাম্যহং যুগে যুগে')। লোডশেডিঙের কলকাতায় সেই রাত্রের স্মৃতি উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে উপমাস্থলে 'জন্মাষ্টমীর মত অন্ধকার' ওপরের পঙ্‌ক্তিগুলিতে আমাদের আকর্ষণ করে। যেমন করে এই কবিতার সূচনাংশে পেরেকে-টাঙানো 'দু দেয়ালে রুজু রুজু / দুটো ছবি'র উল্লেখ—

একটিতে কাঁটায় বিদ্ধ
যীশুখৃষ্টীষ্ট।



অন্যটিতে
হেলায় করেন কর্ণ মৃত্যুকে বরণ
রথের চাকায় হাত রেখে।

এই দুটি স্তবক এবং 'জন্মাষ্টমীর মত অন্ধকার' ইংগিতের মধ্যে নাটকীয় চরিত্র হিসেবে ভর রাখছে 'কুমারী মা'। 'কর্ণ' চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ওপরে উদ্ধৃত শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে আমরা লক্ষ্য করি গলা কেমন টাল খেয়ে গেছে, পাঁচালীতে যে সুর ফোটে অনেকটা সেই ধরণে। খৃষ্ট, কর্ণ এবং জন্মাষ্টমীর উল্লেখে দুঃখ বিপদ-তুচ্ছ করা কঠিন কাজে আত্মনিয়োগের গৌরবে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তিনজনকে এক প্রেক্ষিতে এনে শ্রদ্ধা নিবেদন কেবল কবির উদ্দেশ্য ছিল না বোঝা যায়। বিবাহ বন্ধনের বাইরে শিশু সন্তান উৎপাদন আজকের দিনে যে সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে (বিশেষত পশ্চিমে), তার পরিপ্রেক্ষিতে ওপরে বর্ণিত ছবি। মুখোমুখি ছবি দুটির নিচে স্থান করে নিয়েছে যে পঙ্‌ক্তিগুলি ('বিধিবহির্ভূত দুটি / চিরঞ্জীব / জন্মের মহিমা') সেগুলি সংস্কারমুক্ত মনের নির্দেশ দিতে পারে। জন্মাষ্টমীর অনুষঙ্গে আসে উৎপীড়নকারী শাসনের উচ্ছেদ। নতুন জন্মের প্রসঙ্গ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় "ফুল ফুটুক" পর্যায় থেকে কিভাবে উৎসাহের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে, অশ্রুকুমার শিকদার তার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে সে সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কবিতায় নবজাতকের সংবাদ পৌঁছে দেবার আগ্রহ কিন্তু চল্লিশ দশক থেকেই সাম্যবাদী শিবিরে লক্ষ্য করেছি। সুকান্ত ভট্টাচার্য থেকেই সম্ভবত এর সূত্রপাত। তাঁর 'ছাড়পত্র' কবিতাগ্রন্থের নাম কবিতাটিই তো দৃষ্টান্ত হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

"ফুল ফুটুক" পর্যায় থেকে লক্ষ্মীর আবাহন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ঘটেছে। ভবিষ্যতের আশা এবং বর্তমানের শ্রী ব্যক্ত করতে স্মরণীয় হয়ে আছে এই সব পঙক্তি

হিরণ্যগর্ভ দিন
হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আসছে,
গান গেয়ে
আমাকে বলছে দাঁড়াতে। ('এখন ভাবনা' / "ফুল ফুটুক")

আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি
লক্ষ্মীর পা,
আমি যত দূরেই যাই ('যত দূরেই যাই')

লক্ষ্মীলাভ নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতায় মস্করাও করেছেন 'লক্ষ্মী এলেন / রণপায়ে / লোকটা জানতেই পেল না' ("যত দূরেই যাই")।

মিথ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাকে মাঝে মাঝে আকার দিলেও আলোচনায় আর অগ্রসর হবার আগে স্বীকার করে নিতে চাই, মিথ এই কবির সামান্য অংশকেই স্পর্শ ক'রে আছে। এর কারণ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি-নির্ভর যে ধরণের কবিপ্রতিভা তাঁর, তা মিথের সাধারণ আধারে প্রায়ই ধরা দিতে চায় না। আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে যারা বিশেষভাবে মিথ কাজে লাগিয়েছেন তাদের নাম করতে গিয়ে প্রবন্ধের এই অংশের সূচনায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ আমি তাই করে উঠতে পারিনি। ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বাঙালী লেখকের যথেষ্ট মনে হয়নি। মহাকালের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে দেখতে চেয়েছিল। "মহাভারত" থেকে তাঁর সাহিত্যকর্মে উঠে এসেছিল 'মুষল পর্ব' 'যদুবংশ' ইত্যাদি কাহিনীর স্মৃতি। ষাট দশকের শেষে এবং সত্তর দশকের শুরুতে কৃষি বিপ্লবের আদর্শ রূপায়িত করতে পশ্চিমবাংলা এবং মধ্যপ্রদেশে যে গণ আন্দোলন সংঘটিত হয়, মধ্যবিত্ত বাঙালী মূল্যবোধের কাছে তা বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হয়। এইকালেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতাগ্রন্থের নাম হিসাবে তার সমগ্র লেখকজীবনে একবার মাত্র মিথ অবলম্বন করেন—"ছেলে গেছে বনে।" (প্রথম প্রকাশ ১৯৭২)। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলির সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করতে হলে পূর্ববর্তী দুই দশকে তাঁর মানসিক বিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা ধারণা করা প্রয়োজন।

স্বদেশী যুগ থেকে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা বাংলাদেশের চরমপন্থীদের মাঝে মাঝেই উদ্বুদ্ধ করেছে। কমুনিষ্ট দল এর সঙ্গে যোগ দেয় বলপূর্বক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের তত্ত্ব। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে এই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার কর্মসূচীর সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘকালের যোগ সকলেরই জানা। "পদাতিক" থেকে "ফুল ফুটুক" পর্যন্ত মার্ক্সীয় ধ্যান-ধারণা তিনি সযত্নে লালন করেছেন। "অক্ষরে অক্ষরে" নামক গদ্যগ্রন্থে তিনি যা বলেন তা তাঁর সারা জীবনের বিশ্বাস :

'ভস্মলোচনের মতো যে সমাজ বেশীরভাগ মানুষকে দগ্ধায়, তার ছায়া ফুটিয়ে তুলে শিল্প-সাহিত্য সেই সমাজকে ধ্বংস করার কাজে হাত লাগাতে পারে।

তেমনি আবার নতুন ভবিষ্যৎ নতুন জীবনকে এগিয়ে আনবার কাজে সহায় হতে পারে শিল্প সাহিত্য।'



ক্রুশ্চভ আমলে স্টালিনের পুনর্মূল্যায়ন কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট মহলে চীন-সোভিয়েত মত-পার্থক্য এবং তার জের হিসাবে ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টির দুই খন্ডে ভাগ, "ফুল ফুটুক" গ্রন্থের পরবর্তী পর্যায়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাকে পূর্বের থেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করেছে। নিজের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়ায় ('মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ') আমরা দেখি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজবাদের ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস শিথিল হয়নি।

ধনতন্ত্রের বাঁচবার একটাই পথ
আত্মহত্যা।
দড়ি আর কলসি মজুত
এখন শুধু জলে ঝাঁপ দিলেই হয়।

ভারতবর্ষের পুঁজিবাদের অসম্পূর্ণ বিকাশ এবং বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক শক্তি বিন্যাসের অভাবে নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে তাঁকে বলতে হয়,

চোখ খুলে তাকাবার
মন খুলে বলবার
হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখাবার—
মুখুজ্যে, তোমার সাহস নেই।

আগুনের আঁচ নিভে আসছে
তাকে খুঁচিয়ে গনগনে করে তোলো
উঁচু থেকে যদি না হয়
নিচে থেকে করো।

সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার সংকল্প গ্রহণ করে "যত দূরেই যাই" গ্রন্থের শেষ কবিতা 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ' সমাপ্ত হলেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী কাব্য সংকলন "কাল মধুমাস" পার্টির অভ্যন্তরীণ সংকটের উল্লেখ এড়িয়ে যেতে পারে না। এই গ্রন্থের 'হাত বাড়ালে' কবিতায় কবি বলেন 'চারিদিকে ছিন্নভিন্ন, / সভার বিরুদ্ধে সভা বসে গেছে, সমিতির বিরুদ্ধে সমিতি।' তিনি বলেন—

কারো মুখের কথায় আর আমার বিশ্বাস নেই।
আমি হাতেনাতে প্রমাণ চাইব।
আমাকে কেউ মুখের কথায় বিশ্বাস করুক
আমি চাই না। ('এই জমি')

এই স্পষ্ট ভাষণের পর আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না গ্রন্থের প্রথম যে কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি আমরা নিছক বিবৃতি ভেবেছিলাম, হয়তো সেগুলির গভীরতর গূঢ়তর তাৎপর্য আছে—'দজ্জাল ঘড়িটা / একদিন আমাকে বাজিয়ে নেবে বলে টিকটিক শব্দে শাসিয়েছে' ('তোমাকে বলি নি')। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন, যা আমাদের কাছে বিস্ময়কর। কারণ "ফুল ফুটুক" পর্যায় পর্যন্ত মার্ক্সীয় নির্দেশানুযায়ী সাধারণের বিশ্বাসভূমি থেকেই সুভাষ কবিতা লিখেছেন। "কাল মধুমাস" গ্রন্থে কিন্তু তিনি মানবিক সম্পর্কের আরো জটিলে প্রবেশ করেন।

একাকিত্বের সমাহার ? নাকি
সমাহৃত একাকিত্ব ?
একে একে দুই অথবা একের মধ্যেই আছে দ্বিত্ব ?
বন না বৃক্ষ ? ঘুরে ফিরে শেষে
আজও সেই একই বৃত্ত ? ('দ্বৈপায়ণ')

'কাল মধুমাস' এবং 'যত দূরেই যাই' গ্রন্থ দুটি থেকে প্রবন্ধের পূর্বভাগে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাল চেতনার পরিচয় দিতে যে কাব্যাংশদ্বয় উদ্ধার করেছিলাম তার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। 'যেতে যেতে' কবিতায় সময় যে আমাদের নিত্য সহচর, এটুকু মাত্র তিনি বলেন তাঁর মতো ক'রে। সময়ের ব্যক্তিগত মূল্যকে তাঁর প্রথম স্বীকৃতিদান "কাল মধুমাস" গ্রন্থে। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ "যত দূরেই যাই" থেকে স্বীকরণের প্রস্তুতি চলছিল, কিন্তু মুখ ফুটে বলা হয়নি। 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ' এবং 'কাল মধুমাস'—আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ দুটির প্রধান দুই রচনা—পাশাপাশি পাঠ করলে এই বক্তব্য সমর্থিত হয়। প্রথম কবিতাটিতে বহির্জগতের ঘটনাবলী বেশি স্থান পেয়েছে। বিপরীতে "কাল মধুমাস" গ্রন্থের নাম কবিতায় স্মৃতিপটে বিচ্ছিন্ন টুকরো এবং তার মধ্য দিয়ে জন্মমুহূর্তে থেকে বেড়ে ওঠার বিবরণই প্রধান। ('কাঁথিতে লবণ সত্যাগ্রহ এবং গ্রামে তার প্রতিক্রিয়া এরই মধ্যে কবিতার দুটি স্তবক অধিকার ক'রে আছে) দৃষ্টির অন্তর্মুখিনতার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্মৃতির প্রসঙ্গও উঠে আসছে সুভাষের কবিতায় "যত দূরেই যাই" গ্রন্থ রচনার সময় থেকে—নাম কবিতাটি এবং 'ছাপ' ('কেউ দেয় নি কো উলু / কেউ বাজায়নি শাঁখ') যার উদাহরণ। "কাল মধুমাস" গ্রন্থের প্রথম কবিতাটিই নিজস্ব সংসারের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে। জনতার আব্দার রাখতে যে তিনি আর প্রস্তুত নন ('ফড়েদের প্রতি'), —যে সব খবর নিয়ে বাজার উত্তেজিত, প্রকৃত সমস্যা তার চেয়ে ঢের বড়—তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন— 'আদতে দোষটা হল গিয়ে চোখের ধুলির—কেননা সমস্যাগুলো ওর চেয়ে ঢের ঢের বড়ো' ('এদিকে')। বাহিরে ভুল হানবে যখন অন্তরে ভুল ভাঙবে কি ? প্রশ্নটি এবার



অনিবার্যতার আকার পায়। 'পাথরের ফুল' ("যত দূরেই যাই") কবিতায় প্রত্যয় যাচাইয়ের কথা বলেছেন সুভাষ—

না।
আমি আর শুধু কথায় তুষ্ট নই,
যেখান থেকে সমস্ত কথা উঠে আসে,
যেখানে যায়—
কথার সেই উৎসে।
নামের সেই পরিণামে,
জল-মাটি-হাওয়ায়
আমি নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাই।

দলীয় সংগঠন ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর যে সীমারেখা আরোপ করতে চায় 'এই ভাই' গ্রন্থের কবি তাতে বাঁধা পড়তে নারাজ। একদিকে পেটো-হাতে মস্তান, অন্যদিকে সময়ের সঙ্গে তাল-দিয়ে চলা সুবিধাবাদীর দল—এই গ্রন্থের 'পূর্বপক্ষ' 'উত্তরপক্ষ' কবিতা দুটিতে—সমাজের এই দুই অংশের ছবি এঁকেছেন কবি। এমনকি জেলে যাদের সঙ্গে এককসময়ে ঘনিষ্ঠতা তাদের সঙ্গেও ভাবের আদান-প্রদান পূর্বের মতো সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, এই গ্রন্থেরই আরেকটি কবিতায় ('জেলখানার গল্প') তিনি যেমন আক্ষেপ ক'রে বলেছেন, বর্তমানে আমরা 'নিজেদের জালে বন্দী; নিজেদেরই তৈরী করা জেলে'। স্মৃতির নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণও কবির পক্ষে সম্ভব নয়। 'উৎসে ফিরে যাবার / ছলাৎছল শব্দ' কানে পৌঁছতে, ঘুরে দাঁড়ালে তিনি টের পান 'কোথাও গনগনে আঁচে / কিছু একটা সাঁতলাবার আওয়াজে / হঠাৎ এ গলির বুকটা / ছাঁৎ করে উঠল' ('কে যায়')। ব্যক্তিগত জীবনে আমরা জানি পার্টির সঙ্গে এই সময়ে তাঁর বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ। মুঠি উঁচিয়ে আগের মতো গলা তুলতে তিনি যেমন প্রস্তুত নন, পার্টিও তাঁকে সেরকম 'প্রতিক্রিয়ার' শিবিরে ঠাঁই দিয়েছে। ("এই ভাই" গ্রন্থের 'দুয়ো' এবং 'ল্যাং' কবিতা দুটি যথাক্রমে দ্রষ্টব্য।) সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার প্রাপ্তিতে (১৯৬১) আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী মহলে তাঁর স্বীকৃতি উপলক্ষ্য করে পার্টির ভিতরে তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ, সমালোচনা এবং অনাস্থার ভাব প্রকাশ সেকালের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন। "কাল মধুমাস" গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কবি আবেদন করেছিলেন—'দরোজা খোলো, / ফিরে এসেছি—দরজা খোলো / ফিরে এসেছি / দরজা খুলে ডাকো' ('কাছের লোক')। মত অপরিবর্তনীয় বুঝে "এই ভাই" গ্রন্থে তিনি সে চেষ্টা করেননি। নিজেকে বোঝাতে বলেন—'সময়মত যাওয়ার মধ্যেই জীবনের সৌন্দর্য' ('এক অস্থায়ী চির')। প্রতীকে আশাহতের ভাষা ফোটে :

উড়ে গেছে আলোর নীল পাখিটা।
তাই মুখ কালো করে
অভিমানে
দেয়ালে ঠিক্‌রে আছে
মরচে ধরা লতা পাতায়
লোহার বাসরে
শূন্য খাঁচা।

আলোর নষ্ট নীড়ে উধাও
মই কাঁধে উধাও
বুড়ো বাতিওয়ালা।

( 'কে যায়' )

"ছেলে গেছে বনে" বইটি—বিশেষত তার নাম কবিতাটি—আলোচনা করার আগে এই গ্রন্থ রচনার পূর্ববর্তী দেড় দশক কবি যে অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে এসেছেন তা স্মরণ করা প্রয়োজন। সময়ের কোমলে-কঠোরে মিশ্রিত রূপে কোন সচেতন ব্যক্তির দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু নেহেরুর মৃত্যুকালে সময়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় রূপে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তিনি বলতে পারতেন —

চষা মাটির মতো এবড়ো খেবড়ো সময় ;
চলতে কষ্ট হলেও
জানি, তার গর্ভে ছড়ানো আছে বীজ।

( 'লাল গোলাপের জন্য' / "কাল মধুমাস" )

'ছেলে গেছে বনে' কবিতায় সময় স্তব্ধ। তাঁর উপমা কলকাতার নিজস্ব একটি যান, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ( "যত দূরেই যাই" থেকে শুরু করে ) যার বহুল ব্যবহার অশ্রুকুমার সিকদার লক্ষ্য করেছেন। 'ছেলে গেছে বনে' কবিতায় সেই যানটি অচল।

সময় দাঁড়িয়ে আছে
মাথার ওপর তার ছিঁড়ে
যেন বন্ধ ট্রাম।

এই নিষ্প্রাণ দিশাহীন পরিবেশে আগুন জ্বালাতে শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন চোখে নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল আদর্শবাদী একদল যুবক-যুবতী নকশালবাড়ি আন্দোলনে।



উপন্যাসে তাদের কাহিনী বিবৃত করেছেন দুই সমরেশ—বসু ("মহাকালের রথের ঘোড়া") এবং মজুমদার ( "কালবেলা" ),—মহাশ্বেতা ( "হাজার চুরাশির মা" )। কবিতায় সেই মারাত্মক হিংস্র উদ্‌ভ্রান্ত কালপর্বের রক্তাক্ত আলেখ্য ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছেন নীরেন্দ্র-বীরেন্দ্র-শঙ্খ-মণিভূষণ প্রমুখ। আধুনিক বাংলা শিল্প-সাহিত্যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাব-প্রতিফলন বিষয়ে একদিন হয়তো বিস্তৃতাকারে গবেষণাপত্র রচিত হবে। আপাতত আমরা কেবল একটি বিশেষ কবিতার আলোচনায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারি।

সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যে তাঁর আর বিশ্বাস নেই পঞ্চাশের দশকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় তা পরিষ্কার ঘোষণা করেছিলেন "ফুল ফুটুক" কাব্যগ্রন্থে। গ্রন্থটি শেষ হচ্ছে একটি আবেদনে—'দেখো, / যেন আমাদের অসাবধানে / এই দামাল দিনগুলো / গড়াতে গড়াতে / গড়াতে গড়াতে / আগুনের মধ্যে না পড়ে।' ( এখন ভাবনা' )। এই গ্রন্থেরই পূর্ববর্তী এক কবিতায় উদ্দেশ্যহীন ভাঙার বিরুদ্ধে তাঁর প্রার্থনা—'ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়' ('শুধু ভাঙা নয়')। ধনতন্ত্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সাম্যবাদের শেষ জয় ঘোষিত হবে—ক্রুশ্চভের এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে "যত দূরেই যাই" গ্রন্থের শেষ রচনায় সুভাষ বলেন—'নিঁবিবাদে নয়, / বিনা গৃহযুদ্ধে / এ মাটিতে সমাজতন্ত্র দখল নেবে' ( 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ' )। এমনকি এই ধরণের মনোভাবকে 'আপোষমূলক' 'প্রতিক্রিয়াশীল' ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে জেনেও তিনি তাঁর মত পাল্টাতে রাজি নন।

'ফুল্‌কি ছেড়ে ফুল ধরেছেন
মিছিল ছেড়ে মেলা
দিন থাকতে মানে মানে
কাটুন এই বেলা।'
হেই দাদাগো ছাড়ুন ঠ্যাং
চলে যাচ্ছি ড্যাডাং ড্যাং।

( 'ল্যাং' / 'এই ভাই' )

নকশালবাড়ি আন্দোলনে লিপ্ত যুবকবৃন্দের প্রতি সুভাষ মুখোপাধ্যায় উপেক্ষায় মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারতেন। পরিবর্তে আমরা তাঁর লেখায় পাই গভীর মমত্ববোধ। 'ছুরিবিদ্ধ গুলিবিদ্ধ / অপাপবিদ্ধের দল' তিনি জানেন 'অন্ধ গলিতে এসে ঠেকে গেছে।' / শহীদের স্মৃতি রাখতে শহীদ হওয়া, / খুনের বদলে খুন— / এই বৃত্তটাকে কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না' ( 'ফেরাই' / "ছেলে গেছে বনে" )। ব্যক্তি সন্ত্রাসের রাজনীতির

আত্মঘাতী পরিণাম এই। কিন্তু পথ ভুল হলেও আন্দোলনকারীদের আত্মত্যাগ এবং আন্তরিকতা বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার পরিকল্পনা সার্থক করতে শহর ছেড়ে নির্ভয়ে যে তরুণ দল যৌবনের সোনালি দিনগুলি অকাতরে বিসর্জন দিয়ে কৃষকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাদের পিতৃসত্য রক্ষার্থে বনবাসী রামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নকশালবাড়ি আন্দোলনে লিপ্ত যুবকদের চারিত্রিক সততা এবং সংকল্পনিষ্ঠার প্রতি তাঁর অভিবাদন এই তুলনার মধ্য দিয়েই ধরা পড়েছে। 'মুক্তির বহুবর্ণ বাসনার নীচে / যৌবনকে পণ ধরেছিল জীবন'—"ফুল ফুটুক" কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতায় তিনি লিখেছিলেন ('এখন ভাবনা')। নকশালবাড়ি আন্দোলনের চরিত্র বর্ণনায় পঙ্‌ক্তি দুটি অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়। যেমন যায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকা মূল্যায়নে সুভাষচন্দ্রের প্রতি পত্রে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ঃ

'দেশে তারা দ্বীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল—ভুল করে আগুন লাগালো, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে করে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীরহৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখিনি। তাদের সেই ত্যাগের পরে ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণনিবেদন, আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে, কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে, চিরদিনের মতো প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে।' ('দেশনায়ক' / "কালান্তর")★

এই ইচ্ছাশক্তির আকর্ষণ একদিন কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যান্য বহু কর্মীর মতো সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আন্দোলনের পথে টেনেছিল। বিপ্লবের পথে সমাজবাদে উত্তরণের যে বক্তব্য পার্টি চল্লিশের দশকে প্রচার করেছিল, নকশালবাড়ি আন্দোলন তাবেই বাস্তবায়িত করার স্বপ্ন দেখেছিল। পিতৃসত্য রক্ষার্থে রামের বনবাস গমনের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নকশাল যুবকদের এ কারণে মিল খুঁজে পেয়েছেন। যৌবনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি দশরথ যেমন পরে বিস্মৃত হয়েছিলেন সেরকম কম্যুনিষ্ট পার্টিও পরে বিপ্লবের অঙ্গীকার থেকে সরে এসেছে। সাদৃশ্য এদিক দিয়েও। পার্টির সঙ্গে ষাট দশকের শুরু থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা আমরা ইতিপূর্বে বিশ্লেষণ করেছি। নকশালবাড়ি আন্দোলনের আঁচ এই পরিস্থিতিতে তাঁকে ফিরিয়ে দেয় তাঁর অতীতে। 'ছেলে গেছে বনে' কবিতায় নাটকীয় টানাপোড়েন রচিত হয়েছে বর্তমান ও অতীতের তুলনায়। এই কবিতার বিভিন্ন স্তরে একদিকে কবি তাই বলেন 'পুরনো

★"রবীন্দ্র রচনাবলী", পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৯।



স্মৃতির সঙ্গ / নেব আজ ঝেড়ে ফেলে সব দুর্ভাবনা' এবং 'ফিরে পেতে চাই সেই বাল্যের বিস্ময়'। অন্যদিকে সমাজের যে স্তরে বর্তমানে তাঁর চলাফেরা তাকে একটিমাত্র দৃশ্যে বোঝানোর চেষ্টা—

পাশের টেবিলে একটা লোক
একেবারে টুপভুজঙ্গ।
সোডার বোতলে আমি ঠিক রাখছি চোখ,
কিছুতেই মাত্রা ছাড়াব না।

'কাল মধুমাস' কবিতাটি যদি মুখ্যত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ হয়, তবে 'ছেলে গেছে বনে' তাঁর বিবেক দংশন। এই কবিতাটির সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাঁর পূর্ববর্তী বহু কবিতার পঙ্‌ক্তি আমাদের কাছে ভিন্ন তাৎপর্যে উপস্থিত হয়। 'সেদিনকার শাণিত ধার হারিয়েছি / হৃদয়ে শুধু স্মৃতির ভার, ভাঁড় শুধু।' "চিরকুট" কাব্যগ্রন্থের সূচনার এই দুটি পঙ্‌ক্তি রচনাকালে তাঁর বয়স ত্রিশ অতিক্রম করেনি। পার্টির সঙ্গে সম্পর্কে ধরেনি ফাটল। বিপরীতে 'ছেলে গেছে বনে' কবিতা লেখার সময় তিনি চল্লিশ পেরিয়েছেন, পার্টির সঙ্গে পূর্বের ঘনিষ্ঠতা নেই। 'ছেলে গেছে বনে'র কবি মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের সেই অংশের প্রতিনিধি, জীবনের একটা বয়স অবধি রাজনীতির সঙ্গে যাদের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। পরে সেই যোগ সক্রিয় না হলেও মনের সব জানলা দরজার কবাট বন্ধ হয় না।

এখনও মিছিল গেলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াই রাস্তায়,
যে কোন সভায় গিয়ে শুনি
কে কী বলে।
কেউ কিছু ভালো করলে দিই তাতে সায়
সংসারে ডুবেছি তাই জ্বালাই না ধূনি।

মধ্যরাতে পলাতক নকশালকর্মীর খোঁজে পুলিশের কড়া নাড়া এই সুপ্ত বৈপ্লবিক বাসনাকেই জাগিয়ে তোলে—'যে আগুন প্রায় নিবন্ত, ওরা তার তুলছে আঁচ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে।' এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ' কবিতার শেষাংশে কবি স্বীকার করেছিলেন আঁচ নিভে আসার কথা। তা উস্‌কে দেবার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন।

আগুনের আঁচ নিভে আসছে
তাকে খুঁচিয়ে গনগনে ক'রে তোল
উঁচু থেকে যদি না হয়
নিচে থেকে করো।

নকশালবাড়ি আন্দোলন দমনে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ মনে হয় এই কাজই সম্ভব করে তোলে। কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্যকলাপের ঐতিহাসিক পরিণাম হিসেবেই এই আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশ, নিয়তির স্থান তাতে নেই। রামের বনবাস যাত্রার এক সপ্তাহের মধ্যেই রাজা দশরথ দেহরক্ষার ফলে পুত্রশোক থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু কবির যন্ত্রণা আরো দীর্ঘস্থায়ী যেহেতু সংসার তাকে দেয়নি মুক্তি—উত্তরসূরীর হাতে তুলে দিয়েছে বরং বহু বিপদ সত্ত্বেও তার অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করার দায়িত্ব। 'ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে / ছেলে গেছে বনে' পঙ্‌ক্তি দুটি যে কারণে সমগ্র কবিতাটিতে ফিরে আসছে ধুয়োর মতো।

গ্রীক পুরাণ থেকে আরেকটি কাহিনী পরিপূরকরূপে বেছেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় "একটু পা চালিয়ে, ভাই" কাব্যগ্রন্থটির 'সাজা চাই' কবিতায়। গ্রীক উপাখ্যান অনুযায়ী দেবাদিদেব জিউস রাজা ট্যান্টেলাস-কে কিছু গোপন সংবাদ দিয়েছিলেন। পরে ট্যান্টেলাস গোপনীয়তা ভঙ্গ করেন। মৃত্যুর পর এই কারণে তাকে ক্ষুধাতৃষ্ণায় জর্জরিত হতে হয়েছিল। হাতের সামনে ফল এবং হ্রদের জল থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষে পানাহার করা সম্ভব হয়নি যেহেতু খাদ্য এবং পানীয় সর্বদাই তার নাগাল এড়িয়ে যেত। এই কাহিনীর অন্য এক সংস্করণ অনুযায়ী দেবতাদের পরীক্ষা করতে তিনি তার পুত্র পেলপস্‌কে হত্যা করে তার মাংস দেবতাদের গ্রহণ করতে দিয়েছিলেন। 'সাজা চাই' কবিতাটিতে পৌরাণিক কাহিনীর দুটি সংস্করণই ব্যবহার করা হয়েছে—পুত্রহত্যা, ট্যানটেলাস। কিন্তু তাদের চাইতেও বেশী অপরাধী কবির মতে সেই সব ব্যক্তি যারা ট্যান্টেলাসকে পুত্রহত্যায় প্ররোচিত করেছে। 'ফেরাই' কবিতাটিতে এদের সনাক্ত করার আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন। 'সাজা চাই' কবিতায় এদেরই শাস্তি তিনি দাবী করেন।

ওপরের দৃষ্টান্ত থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় মিথ প্রয়োগের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। সন্দেহ নেই, সভ্যতার ঊষাকালে মিথ যেভাবে মানুষের মন অধিকার করতো বর্তমানে তা করে না। আধুনিক মানুষ মিথের শরণাপন্ন হয় নিজের অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃততর রূপদানের উদ্দেশ্যে। মিথের মূল তাৎপর্যের বিপর্যয়ও ঘটায় ক্ষেত্রবিশেষে। মধুসূদনের মন্তব্য I hate Rama and his rabble এর বিখ্যাত উদাহরণ। রামচন্দ্রের চরিত্র সম্পর্কে এই ধরণের মনোভাব পোষণ না করলেও স্বয়ং আদি কবির মূল্যায়নে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুরূপ দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন 'ছেলে গেছে বনে' কবিতায়। রামচন্দ্রের বনবাস গমনের শোকে দশরথের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়ে বাল্মিকী রচনার জটিলতা এড়িয়ে গেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। বরং রত্নাকর চরিত্রটির বিচরণ রক্তমাংসের গুণে তাঁর আরো মানবিক বোধ হয়। 'কাছে এসো



রত্নাকর, দূর হটো বাল্মিকী' পঙ্‌ক্তিটি তাই 'ছেলে গেছে বনে' কবিতায় কেবল পূর্ববর্তী ছত্রের 'আমি তবু পদাতিক ; হাতে বাজছে রণবাদ্য দ্রিমিকি দ্রিমিকি'—সঙ্গে প্রাণ্তিক মিলের খাতিরে উঠে আসেনি যদিও দুটি চরণের ঘনিষ্ট সান্নিপাতে নাট্যগুণ স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে ওঠে।

এইভাবে আমরা দেখি বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদ বা মিথ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভূতিতে জারিত হ'য়ে কবিতায় স্থানলাভ করে। মিথের চরিত্র মাধ্যমে উত্তম পুরুষে তিনি কখনোই তাঁর বক্তব্য নিবেদন করেননি যেমন বাংলা কবিতায় আরো অনেকে করেছেন। ব্যক্তিত্বের ছাপ তিনি তাঁর কবিতায় বজায় রাখতে চান বলেই সময় তাঁর হাতে নিজস্ব একটি চরিত্র লাভ করে, সাধারণের মধ্যে থেকেও যা সবিশেষ। এই প্রবন্ধের প্রথম উদ্ধৃতিটির দিকে তাই পুনরায় নজর দেবার প্রয়োজন বোধ করি যেখানে পাঠককে উদ্দেশ্য ক'রে তিনি বলেছেন 'তোমার সময় দিয়ে তাই / বৃথা চেষ্টা আমাকে মাপবার।'

## নাগরিক মন ও বাংলা কবিতা ঃ পঞ্চাশ ষাট সত্তর

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

"জীবন ক্রমে শহরমুখী ও শহরনির্ভর হয়ে উঠছে। মানুষের সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে শহর। বড় বড় শহর তাই 'পলিস' থেকে 'মেট্রোপলিস' ও 'নেক্রো-পলিসে'র মর্মান্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পদে পদে যান্ত্রিকতা এবং তার সঙ্গে পাশাপাশি দৈত্যের মতো বিপুল জনতার দলনমর্দন। এর মধ্যে পড়ে মানুষ তার নিজস্ব মানবিক মূল থেকে কখন যে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা সে নিজেই জানতে পারে না।" —বিনয় ঘোষ

১৯৪৭-এর দেশভাগ কলকাতার নাগরিক জীবনে এক আমূল পরিবর্তন আনে। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে এই শহরের জনসংখ্যা বাড়তে থাকে অবিশ্বাস্য গতিতে। বাস্তুহারা, গৃহহারা, ছিন্নমূল, নিরাশ্রয় মানুষেরা দলে দলে এসে ভীড় জমায় কলকাতার রাস্তাঘাটে, ফুটপাতে, স্টেশনে, বাজারে এবং পার্কে। শোনা যায়, উত্তর কলকাতার আশেপাশে ( সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব পশ্চিম' উপন্যাসেও এরকম বিবরণ আমরা পাই ) অনেক ফাঁকা বাগানবাড়ি রাতারাতি বেদখল করে নেয় উদ্বাস্তুদের দল। জনসংখ্যার এরকম আকস্মিক স্ফীতির পরোক্ষ প্রভাব অনুভূত হয় কলকাতার সামাজিক জীবনে, পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধায় এবং খাদ্যশস্যের ভাণ্ডারে। অন্যদিকে দেশবিভাগের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে হাজির হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মানুষ মানুষের প্রতি কতো নির্দয় ও হিংস্র হতে পারে তার মহা-প্রদর্শন শুরু হল কলকাতার অলিতে গলিতে, পাড়ায়-পাড়ায়। ডোবার ঘোলা জলের মতো এই শহরের আয়েসী, শ্রমবিমুখ জীবন যেন হঠাৎ শূন্য থেকে নিক্ষিপ্ত এক বিশাল পাথরের আঘাতে কেঁপে উঠল; আন্দোলিত হল প্রবলভাবে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমানুপাতিক হারে খাদ্য-উৎপাদন, বাড়ি-ঘর এবং চাকরির সুযোগ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব ছিল না। শুরু হল কনট্রোল রেশনিং ও কালোবাজারী দৌরাত্ম্য। সকলের অলক্ষ্যে কখন যেন নিঃশব্দে রোজকার বেঁচে থাকার মধ্যে অনুপ্রবেশ করল নীচতা, রেষারেষি এবং ইঁদুর-দৌড়ের প্রতিযোগিতা। সামাজিক জীবনের এই অশুভ চোরাটান, একটু একটু করে প্রতিদিন মানুষের এই নৈতিক পতন, এই 'Progressive degradation',—চিন্তায় রেখেই পঞ্চাশ এবং তার পরবর্তী দুই দশকের কবিতা আমাদের পাঠ করতে হবে।

হালকাভাবে দেখলে মনে হতে পারে যে, পঞ্চাশের কবিতায় শুধুই যেন তুমুল আত্মপ্রচার, 'উচ্চকণ্ঠ আত্মঘোষণা', ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং যৌনতার বাড়াবাড়ি। কৃত্তিবাস



গোষ্ঠীর কবিদের বোহেমিজম, বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং কবিতার ভাষা নিয়ে এলোমেলো ভাঙচুর যেন অনেকটাই আরোপিত এবং আকস্মিক মনে হয়। যেন একদল বাউন্ডুলে স্বভাবের যুবক হঠাৎ বাংলা কবিতার মঞ্চে অনুপ্রবেশ করে হৈ-হল্লা ও দাপাদাপি শুরু করে দিলেন। কিন্তু বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, এই বাউন্ডুলে মানসিকতার পেছনে লুকিয়ে আছে একধরনের সামাজিক নিরাপত্তাবোধের অভাব। হতে পারে বীট্ কবি অ্যালেন গিনসবার্গ কলকাতায় এসেছিলেন এবং পঞ্চাশের কবিদের অনেকেই গিনসবার্গের প্রথাবিরোধী জীবনযাপন ও তাঁর কবিতার বিধ্বংসী ভাষাতে অতিমাত্রায় প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু একথাও আমাদের বুঝে নিতে হবে যে পঞ্চাশের তরুণদের এলোমেলো জীবনযাপন এবং কবিতার ছন্নছাড়া ভাষা প্রকৃত প্রস্তাবে নিরাপত্তাহীন, বৈচিত্র্যহীন, অবক্ষয়ী এবং পতনোন্মুখ নাগরিক জীবনের বিরুদ্ধে একধরনের সোচ্চার প্রতিবাদ। একদিকে ঘটছে মানুষের জীবনে চরম অবমূল্যায়ন; আর অন্যদিকে কলকাতার শরীর ক্রমশ প্রকল্পহীন ( unplanned ) গতিতে ফুটে উঠছে। রাতারাতি কাছাকাছি অবস্থিত মফস্বল এবং শহরতলীকেও গ্রাস করে নিচ্ছে কলকাতা। গড়ে উঠছে কলোনীর পর কলোনী। আবার অন্যদিকে অফিস অঞ্চলে আকাশছোঁয়া স্কাইস্ক্র্যাপার। সারি সারি বিল্ডিং-এর মাথা উঁচু হচ্ছে যত, ব্যক্তিমানুষের মাথা তত নুয়ে পড়ছে জীবনের ভারে। এসবের অনিবার্য ফল—বিচ্ছিন্নতাবোধ অথবা অ্যালিয়েনেশন; সমাজবিজ্ঞানীর ভাষায় যার ধারণা ঃ—In the social machines of a technocratic society, people are alienated and are adrift in a world that has little meaning for them and over which they exercise limited power. They become strangers to themselves and to others.' একদিকে পরিকাঠামোগত প্রগতি, আর অন্যদিকে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মুছে যাওয়া;—এ দুয়ের মাঝখানে পিষ্ট হয়ে বিভ্রান্ত আধুনিক কবি অসহায় গলায় চিৎকার করে ওঠেন—'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ / এই কি মানুষজন্ম ? নাকি শেষ / পুরোহিত-কঙ্কালের পাশা খেলা !....'

'I grow old, I grow old, I shall wear the bottoms of my trousers rolled.'— এলিয়েটের প্রুফ্রক যখন এই কথা শোনায় আমাদের, মজা পেয়ে হেসে উঠি আমরা। পরমুহূর্তেই উপলব্ধি করি কি গভীর হতাশা আর বেদনায় ঋদ্ধ এই লাইনগুলো। আধুনিক কবিতায় সম্ভবত এলিয়ট এই চালটা প্রথম আমদানী করলেন। হালকা চালে গভীর কথা বলা। আটপৌরে রঙ্গ-রসিকতা আর শ্লেষের মোড়কের ভেতরে কঠিন এবং অপ্রিয় সত্যগুলো ভরে দেওয়া।—'আমি শ্মশানে গিয়ে মরে

যাবার বদলে, মাইরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বহু-পঠিত কবিতার এই লাইনে ফুটে ওঠে বেকার, বোহেমিয়ান, স্বপ্নহীন এবং নগরমনস্ক এক যুবকের মৃত্যু তথা জীবনের প্রতি গভীর অবজ্ঞা। নিম্নবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার যন্ত্রণা, অভাববোধ এবং দারিদ্র্য ধরা পড়েছে সুনীলের আরো অনেক কবিতায়। যেমন 'আমি মাছহীন ভাতের থালার সামনে বসেছি / আমি দাঁড়িয়েছি চালের দোকানের লাইনে / আমার চুলে ভেজাল তেলের গন্ধ। আমার নিশ্বাস—।' অথবা, '....আমরা যারা চালের বদলে খেয়েছি কাঁকর, চিনির বদলে কাচ / আর তেলের বদলে শিয়ালকাঁটা / আমরা যারা রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা / মৃতদেহগুলিকে দেখেছি / আস্তে আস্তে উঠে বসতে / আমরা যারা লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও গুলির মাঝখান দিয়ে / ছুটে গেছি এঁকে বেঁকে।'

সরস ভঙ্গীতে জীবনের মূল সত্যগুলোকে স্পর্শ করার এই ঝোঁক শঙ্খ ঘোষের প্রথম পর্বের অনেক কবিতাতেই আমরা লক্ষ্য করি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নিহিত পাতাল ছায়া'-র অন্তর্গত এইসব কবিতা—'কিউ', 'বাস্তু', 'ভিড়' ও 'রাস্তা'—। কন্ট্রোল রেশনিং-এর মাহাত্ম্যেই সম্ভবত কলকাতা শহরে 'কিউ' বা লাইনের চলন শুরু হয়। রেশন-দোকানের সামনে থলি-হাতে লাইন, কেরোসিন-তেলের আশায় টিন-হাতে লাইন, কাপড়ের দোকানে মার্কিন-বস্ত্র সংগ্রহের আশায় লাইন, —এরকম চিত্র আমরা চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকের গল্প-উপন্যাসে যেমন পাই, তেমনি পাই শঙ্খ ঘোষ-এর 'কিউ' কবিতার এইসব লাইনে ঃ 'একটু এগোও একটু এগোও / তখন থেকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি একটু এগোও / হে সপিনী, পিচ্ছিলতা একটু নড়ুক—চড়ুক!' এছাড়া,—'আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না, / কলকাতায় থাকে। / আমার মেয়েকে ওরা চুরি করে নিয়েছিল / জবার পোশাকে!' এইসব লাইন আমাদের পরিচিত কবিতা-পাঠকদের মুখে মুখে একসময় উচ্চারিত হত। এই একই ধরনের কবিতা অন্য ঘরানায় শঙ্খ পরেও লিখেছেন ঃ 'বাপজান হে / কইলকাত্তায় গিয়া দেখি সক্কলেই সব জানে / আমি কিছু জানি না।' কলকাতার ভীড়ে ঠাসাঠাসি বাসের মধ্যে এক যাত্রীর বিভ্রান্তি ফুটে উঠেছে 'রাস্তা' কবিতায় ; 'রাস্তা কেউ দেবে না, রাস্তা করে নিন। / মশাই দেখছি ভীষণ শৌখিন—' / চশমা ধরে নেমে এলাম / ঘুরতে ঘুরতে নেমে এলাম / ভুবনখানা টলে পড়ল ভুবনডিঙির পায়ে / ফিরে যাব, ফিরে যাব, ফিরব কী উপায়ে?'—এরকম সংলাপ-উজ্জ্বল স্তবক পড়ে পাঠক মিলিয়ে নিতে পারবেন এই ব্যস্ত শহরে প্রতিদিন তাঁর কর্মস্থানে যাওয়া আর ঘরে ফেরার তেতো অভিজ্ঞতাকে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিরক্ত ও বিব্রত মানুষজনের মুখের সংলাপকে ব্যবহার করে শঙ্খ কবিতার ভাষাকে সাম্প্রতিক ও জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছেন ; একইসঙ্গে তিনি চেষ্টা করেছেন শহুরে জীবনের দুর্দম



গতিকে, চলমান জীবনের চলচ্চিত্রকে কবিতার অন্তর্স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে। তবে উল্লিখিত কবিতাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সফল ও সংকেতবাহী হয়ে উঠতে পেরেছে 'ভিড়' কবিতা,

'ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
চোখ নেই? চোখে দেখতে পান না?
সরু হয়ে যান, ছোটো হয়ে যান—'

আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে।
আমি কি নিত্য আমারও সমান
সদরে, বাজারে, আড়ালে?

নিঃসংশয়ে বলা যায়—এই নির্মাণ সময়োত্তীর্ণ। পরিপ্রেক্ষিত সেই একই, যা 'রাস্তা' কবিতার। বাসের ভীড়ের মধ্যে আটকে-পড়া এক যাত্রী অন্য সহযাত্রীদের কাছে তিরস্কৃত হচ্ছেন তাদের ওঠানামায় বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু 'রাস্তা' কবিতা ছন্দোবদ্ধ বিবৃতির মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে যায় ; মনোযোগী পাঠকের আশাকে প্রায় অপূর্ণ রেখে। পক্ষান্তরে, 'ভিড়' কবিতা শেষ স্তবকে প্রকৃতই জাতে উঠে যায়। অপ্রতিভ বাসযাত্রীর আত্মবিশ্লেষণের অব্যর্থ ছিপে বিঁধে যায় প্রতিদিন সচেতন নাগরিকের একটু একটু করে মরে যাওয়ার যন্ত্রণা, নিজের কাছে ক্রমাগত ছোট হতে হতে আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়ার চাপা গ্লানি।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষকে নানা গোপন ছল-চাতুরি, প্রতারণা এবং কোনো কোনো সময়ে ক্রাইমকেও অবলম্বন করতে হয়। অভাবের জ্বালায় মা সন্তানকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেছে—এ ধরনের সংবাদ আমরা খবরের কাগজে প্রায়ই দেখি। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-এর 'রক্তাক্ত ঝরোখা' কবিতার মধ্যে এক করুণ অপরাধের গল্প লুকিয়ে আছে ;—এরকম যদি বলি তাহলে নিশ্চয়ই পাঠককে বিভ্রান্ত করা হবে না। 'ধানখেতে এসেছিল বেড়াতে দুজন, / ধানখেতে শিশু রেখে পালাচ্ছে দুজন। / 'এবার স্টেশনে চলো' বলল একজন, / 'এবার স্টেশনে চলো' বলল একজন।" শিল্প-নৈপুণ্যে অসম্ভব সফল এই কবিতা লেখার ব্যাপারে স্বয়ং কবি আমাদের জানিয়েছেন ঃ "এক সন্ধ্যায়, অসম্ভব বৃষ্টির পর বাড়ি ফেরার পথ যখন থৈ থৈ জলকল্হার হয়ে আছে, ঢাকুরিয়ার সাঁকোর কাছে এক যুগলের সিলুয়েৎ দেখলাম,

শুনলাম যুবকটি তার সঙ্গিনীকে বলছে : 'এবার স্টেশনে চলো।' আর তক্ষুনি আমি পেয়ে গেলাম, পয়ারের প্রথম আট কদমের দৌলতে, সম্পূর্ণ কবিতাটিকে,.....। নির্ঘাত মনে হলো আমার, ওরা রক্তমাখা কাঁথা মুড়ে ওদের অবিবাহের অবাঞ্ছিত জাতক-যীশুটিকে ব্রিজের নীচের নদীতে—..... একটি নৌকোর ওপর রেখে আসতে চলেছে।" এক পুরুষ ও নারীর 'অবিবাহের অবাঞ্ছিত'—'জাতক-যীশু',—অলোকরঞ্জনের এরকম অনুমানে নাটকীয় উত্তেজনার সম্ভাবনা অনেক বেশী থাকলেও, —আমরা পাঠকেরা, যদি এই কবিতার আড়ালে অন্য কোনো গল্প নিজেদের কল্পনায় বুনে নিই, তাহলেও এই কবিতা সমান মর্মস্পর্শী থাকতে পারে। ঐ 'দুজন' ধরা যাক—বিবাহিত। এবং ঐ শিশু পুরোপুরি বৈধ। ধরা যাক, পিতা ঐ পুরুষ দীর্ঘকাল বেকার। ধরা যাক, ওরা শিশুটির মুখে একমুঠো ভাত বা এক ঝিনুক দুধ তুলে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। শেষমেশ অনাহারে মৃতপ্রায় শিশুর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ওরা দুজনেই একমত হয়ে তাকে হত্যা করেছে এবং ভাসিয়ে দিয়েছে ব্রীজের নীচে—ধানীনৌকোয়। 'বেড়াতে' শব্দটা এই কবিতায় মারাত্মকভাবে ইঙ্গিতবাহী। 'বেড়াতে' যাবার ছলনায় ওরা দুজন খুন করেছে তাদের শিশুকে। এভাবে যদি আমরা ভাবি তাহলে প্রমাণ করা যায়, মেট্রোপলিটন সমাজের এক জ্বলন্ত সমস্যাকে হয়তো নিজের অজান্তেই হাত দিয়ে ছুঁয়ে ফেলেছেন এই কবি। 'আর নেমে এসে দ্যাখে সুন্দর কাঁথায় / রক্তমাখা শিশু নিয়ে ধানী নৌকা যায়।'—এরকম ভয়ংকর-সুন্দর ছবি বাংলা কবিতায় প্রায় বিরল।

খবরের কাগজ পড়া এবং রমন,—আধুনিক মানুষের এই দুটোই হবে একদিন প্রধান কাজ। এরকম অনুমান করেছিলেন ঔপন্যাসিক ক্যামু। নাগরিক জীবনের নীরস একঘেয়েমি বোঝাতে তিনি অন্যত্র বলেছেন—'Waking, tramcar, 4 hours in office or factory, meal, tramcar, 4 hours work, meal, sleep and monday, tuesday, wednesday, thursday, friday and saturday in the same rhythm,....'—ক্লান্তিকর নিয়মের নিগড়ে বাঁধা একই চক্রে ঘুরে চলেছে জীবন। এই চক্র, বিষ্ণু দে-র ভাষায়—'অলাতচক্র।' ক্যামুর এই লাইনগুলোই যেন অনুরণিত হয় বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতায়—'টাল খেয়ে ফিরে আসো বাড়ি। / খাও, দাও, দস্তকে টেলিফোন করো, তারপর / চোখের সামনে তুলে ধরো সকালবেলার / হলুদ খবরের কাগজ, পড়ো / হলুদ হয়ে যাওয়া একটা দেশের গল্প।' ঘটনাহীন, উত্তেজনাহীন, জন্তুর মতো বোধহীন এই বেঁচে থাকা ক্রমে মানুষের দৃষ্টিকেও করে তোলে অস্বচ্ছ এবং হলুদবর্ণ। তখন তার মনে হয় : 'আমাদের আগামী যে দিন সেও ঠিক আসে না কখনো / শুধু ভোর হয়, খালি ভোর হয়, অর্থহীন বোঁচা কালো ভোর / আর তোমার আঙুল ভয়ে বিঁধে যায় আমার আঙুলে' (বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত)। ভয়ংকর এক



শূন্যতাবোধ এবং ভয় আক্রমণ করে যাটের অন্যতম কবি কালীকৃষ্ণ গুহ-কেও। ভয়—একাকীত্বের, অপরিচয়ের, অন্ধত্বের—। গভীর এক 'অন্ধত্বের প্রশ্নে জড়িত' এই কবির কবিতায় তাই শুধুই বিলাপ ; — (১) 'আমার দু'চোখে অন্ধতা নেমে আসবে, আমি টের পাই।' (২) 'অবিমিশ্র ঘুম আর কখনো হবে না। / ফলে, ভয় পাবো। / অসফল ঘুম থেকে উঠে ভয়ে ভয়ে প্রথমেই বারান্দায় যাবো।' (৩) 'এখন রাত্রির শেষে, ক্রমশ রাত্রির শেষে, ক্রমশই রাত্রিগুলি শেষে / ভয়ংকর দিন শুরু হয়।' বিষাদ-প্রেমিক এই কবির কবিতায় কলকাতা জেগে থাকে তার 'ক্রোধ, ঘৃণা, বিজ্ঞাপন, নারীর শরীর আর যৌন-কাতরতা' নিয়ে; —'রাশি রাশি নোংরা ফেলার টিন, টিভির অ্যান্টেনা, কাক'—নিয়ে।

এই শহর বা শহরতলীতে ভোরে ঘুম থেকে উঠেই বিতৃষ্ণায় ভরে যায় মন। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে স্বার্থপর দৌড় শুরু হয়ে যায় দিনের প্রথম থেকেই। একজন কবি লেখেন : 'দেখছি দুধের ডিপোর সামনে লাইন। পশ্চিম দিকে খাটাল, ঘটি হাতে গৃহস্থ মানুষ। এদের প্রত্যেকের হাঁনমুন হয়েছিল এক সময়' (স্টেস ৭ / শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়)। 'খাটাল' বিষয়ে অনবদ্য এক কবিতা আছে সত্তরের প্রতিনিধি কবি রণজিৎ দাস-এর। রণজিৎ আমাদের জানান, 'মাছি, অন্ধকার এবং শিশুচোহিদা দিয়ে তৈরী' খাটালে কিভাবে মানুষ 'রঙ-ওঠা' মোষকে প্রতারণা করে নিজের স্বার্থে : 'মোষ এসব বোঝে না। সে শান্তভাবে ইঞ্জেকশন নেয়। / এক অপ্রকৃত স্নেহের চাপে তার বাঁট ভারি হয়ে ওঠে। / একটি খড়-ঠাসা মৃতবাছুরের মাথা তার সামনে এগিয়ে ধরা হয়। / মোষ পাগলের মত সেটিকে আদর করতে থাকে, / বারবার জিভ দিয়ে চাটে। / আর, এই পদ্ধতিতে / অনর্গল ফেনা-ভাঁত দুধে ভরে ওঠে শহরের বালতি।' এই সেদিন পড়লাম, পিকাসো কাঠ দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন একটা ছাগল। যার শরীর ও মুখ অতি কদর্য। শুধু ঐ ছাগলের দুধের বাঁটদুটো ভীষণ মসৃন, ঝাঁ-চকচকে, পালিশ-করা। ছাগলের সঙ্গে মানুষের প্রতিদিনের স্বার্থ-সম্পর্ক মাথায় রেখেই বোধহয় পিকাসো বাঁটদুটো আলাদা করে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। রণজিৎ-এর কবিতার ঐ প্রতারিত মোষের সঙ্গে পিকাসোর ছাগলের যেন এক প্রাসঙ্গিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

'মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই ; টাঁকশালে আমাদের মন ভাঙে গড়ে।' বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত কমলাকান্তের দপ্তর-এর এই ক্লাসিক উক্তি বর্তমান জীবনে চরম মাত্রায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আমাদের জীবনে এখন টাকাই হল সবকিছুর মূল। টাকা দিয়ে কেনা ভোগ্যপণ্যই নির্ণয় করে সমাজে আমাদের

স্ট্যাটাস। বিজ্ঞাপনের নতুন নতুন চমকে মানুষের 'কনজিউমারিস্ট' প্রবণতা বেড়েই চলেছে আর সেই প্রবণতা বা চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন হচ্ছে টাকার, অনেক টাকার, আরো অনেক টাকার। টাকাকেই ভাস্কর চক্রবর্তী 'কাগজের চাঁদ' বলেছেন তাঁর এক কবিতায়। ছোট এবং হালকা শব্দের ঘর্ষণে ঘর্ষণে ভাস্কর এই কবিতায় তৈরী করেছেন এক নাটকীয় উত্তেজনা, 'টাকা উড়ে যায়। টাকা / হাওয়ায় উড়ছে, ওড়ে। ট্রামের ভেতরে / মাঠে / হোটেলের বারান্দায় / উড়ে যায় পাঁচ-টাকার দশ-টাকার / নোট।' এই 'tension' তুঙ্গে ওঠে পরের লাইনগুলোতে। টাকার পেছনে অন্ধের মতো ছুটতে ছুটতে 'মানুষ আছড়ে পড়ে / স্বপ্নের ভেতরে হাত, ছুটে যায়।' 'স্বপ্নের ভেতরে হাত'—অসাধারণ অতিবাস্তব একটা ছবি,—যা যে কোনো আধুনিক চিত্রকরের কাছে লোভনীয় বিষয় হতে পারে। টাকার জন্য মানুষের এই আসক্তি লক্ষ্য করে সংবেদনশীল কবির মন ঘৃণায় ভরে ওঠে। আর এই ঘৃণাই আলপিন-তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ হয়ে প্রকাশ পায় রণজিৎ-এর অন্য এক কবিতায়ঃ 'একমুঠো খুচরো পয়সা আমি বেমক্কা রাস্তার মোড়ে ছুঁড়ে দিলুম / চেঁচিয়ে বললুম, ভাঁড় ও ব্যাঙ্কসভ্যতাকে এই আমার সামান্য উপহার / লজ্জার মাথা খেয়ে যে যার ভাগ কুড়িয়ে নিন, দু-পাঁচ পয়সা নয় / সব আধুলি আর ওয়ান রুপি কয়েন মোশায়—।' এই ব্যাঙ্ক সভ্যতার চরম পরিণতি কি হতে পারে, মানুষের নৈতিক অবনতি কত ভীষণভাবে ব্যাপক হতে পারে, তার উদাহরণ আমরা পেয়েছি খুব সম্প্রতি, সংবাদপত্রে হর্ষদ মেটা-কেলেঙ্কারীর রোমহর্ষক বিবরণ পড়ে।

খ

'At the end of the awakening comes, in time, the Consequence, suicide or recovery'. ( আলবের ক্যামু )

প্রযুক্তি-নির্ভর সভ্যতার যতো অগ্রগতি হয়, ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্যে মানুষের সামাজিক অবস্থার যতো উন্নতি হয়, ব্যক্তির একান্ত জীবন ততোই প্রয়োজনহীন, ক্লান্তিকর, এবং অশান্ত হয়ে ওঠে। গতিশীল, ব্যস্ত সমাজে মানুষে মানুষে ব্যবধান ক্রমে দীর্ঘ হয়। ফলে ব্যক্তি ক্রমশ ভীষণভাবে একা হয়ে পড়ে। এবং কেউ কেউ এই একাকীত্বের ভার সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের রাস্তা বেছে নেয়। 'অবশেষে হয় আত্মোদ্ধার না হয় আত্মবিলোপ। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার শেষ ব্যক্তিগত সমাধান।' জীবনানন্দ তাঁর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় বাংলা কাব্যের নরম মাটিতে আত্মহননের যে কাঁটা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, তাঁর উত্তরসূরীদের কবিতায় ক্রমে ক্রমে তা ক্যাকটাসে পরিণত হয়েছে। ষাটের কবিদের অনেকেই 'আত্মহত্যা' শব্দটা নিয়ে লোফালুফি খেলেছেন। ভাস্করের কবিতায় কল্পনাপ্রবণ, সংবেদনশীল, অভিমানী এক



যুবক 'অন্ধকার ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে' 'তার ফাঁকা জীবনের কথা' ভাবে। স্পষ্টতই প্রেমে ব্যর্থ এই যুবক 'কলকাতার অলিগলিতে' 'দুঃখিত এক জীবন' বয়ে বেড়ায়। কোনো সুস্থ, সাজানো, ছিমছাম গোছগাছ জীবনের কথা সে ভাবতেই পারে না। তার জন্যে আছে শুধুই 'ট্যাবলেট, আর ট্রাম, কলকাতা, মানুষের শূন্য মুখ বিষাদ, হর্ষের।' নিঃসঙ্গতাবোধে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে যেতে ভাস্কর লেখেন—'হে প্রিয় শহর, তুমি চিঠি কেন লেখো না প্রত্যহ ? / একা একা একা একা, কেঁপে উঠি, মানুষের দেশে।' খুব স্বাভাবিক কারণেই একা এই যুবকের বেঁচে থাকা তাঁর নিজের কাছে নিরর্থক মনে হয়। তাই পাঠক তাঁর কবিতায় সম্মুখীন হন এরকম সব লাইনের ঃ (১) 'মাথা, ভারী হয়ে আসে— / মৃত্যু / দুই-তিন পয়সার খেলা।' (২) 'রাস্তা থেকে ফিরে এসে / আবার আত্মহত্যার / কথা ভাবি। / ভুতুড়ে বাড়ির / ভিতরে ভূতের মতো / শুয়ে আছি। —কতোদিন ?' (৩) 'সত্যি, ইদানীং আত্মহত্যার কথাও ভাবি! নোংরা মশারীর নিচে কাণ্ডজ্ঞানহীন শুয়ে আছি দু'মাস তিন মাস।'

জীবনের সকল ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, বেকারত্বের বিরুদ্ধে, নারীর হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে একবুক অভিমান আর বিধ্বংসী এক রাগ নিয়ে তুষার রায় একসময় তাণ্ডবের ঘোড়ার মতো দাপাদাপি করে গেছেন বাংলা কবিতার এরিনায়। তুষারের অনেক কবিতাতেই ফুটে উঠেছে এক ধরনের স্যাডিজম্। নিজেকে যন্ত্রণা দেওয়ার বিকৃত আনন্দ। যেমন—'বার বার বুক চিরে দেখিয়েছি প্রেম, বার বার / পেশী এ্যানাটমী শিরাতন্তু দেখাতে মশায় / আমি গেঞ্জি খোলার মতো খুলেছি চামড়া / নিজেই শরীর থেকে টেনে।' অন্য এক কবিতায় তিনি বলেছেন—'অভিমান ক্রমশ আমার ফুসফুস খেয়ে ফ্যালে / আত্মভুক নিজেরই যকৃত ছিঁড়ে চিবোই চোয়ালে।' মৃত্যুবোধে দারুণভাবে আক্রান্ত এই কবি আর একটা কবিতায় আত্মহত্যার যে বীভৎস ছবি কল্পনা করেছেন, তার তুলনা নেই— 'আরে ইয়ার- / ফর্দাফাঁই জীবনখানা অল ক্লিয়ার / মুচকি হাসলুম দেখে নিজেরই মুণ্ডু / স্থির রেললাইনে।'

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতাতেও আত্মহত্যার চিত্রকল্প ঘুরে ফিরে আসে। যেমন—'তোমার মতো মানে মরা মাছের স্বপ্ন, / তোমার মতো মানে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে না পারা, / তোমার মতো মানে-ভালোবাসার বদলে / ঘৃণায় কুঁকড়ে উঠে / নিজের দু-হাত দিনের মধ্যে দশবার উঠিয়ে আনতে চাওয়া / নিজের গলার ওপর।' আপাদমস্তক রোমান্টিক এই কবি দুঃস্বপ্ন দেখেন এমন এক ভয়ঙ্কর পৃথিবীর যেখানে শুধু বাস করে—'কম্পিউটর কবি', 'ক্যামেরাম্যান'—যার লোহার বুক, লোহার হাত, লোহার দাঁত', 'মেশিন ভাই-বোন, মেশিন স্বামী-স্ত্রী ও মেশিন মা-বাপ।' সেই পৃথিবীতে

শুধু 'আমাদের সামনে আছে কাজের পাহাড়। ঘুম থেকে উঠে রাত্রি পর্যন্ত / আমরা সেই পাহাড় একটু একটু করে কাটি। সকালবেলা / আবার আস্ত এক পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের জন্য।' কল্পবিজ্ঞানের কবি বলা যায় বুদ্ধদেবকে। যান্ত্রিক প্রগতি যে ব্যক্তিজীবনে আনে শুধুই সংকট, এই সত্য মাথায় রেখে বুদ্ধদেব তাঁর কবিতায় এগিয়ে গেছেন আরো হাজার বছর ভবিষ্যতের দিকে। তিনি কল্পনা করেন এমন এক দিনের যখন মানুষ নয়, এই গ্রহে বাস করবে রোবট। যখন মৃত রোবটের জন্যে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করবে তার প্রতিবেশীরা এইভাবে—'রোবট-ভাইরা, মনে রেখো তাকে। সে ছিল সত্যিই খাঁটি / অকৃত্রিম একজন রোবট, অন্তত তাই হতে / চেয়েছিল সে— / বিশ্বাসহীন, ভালোবাসাহীন, মেধাহীন, অসম্ভব স্বার্থপর / এক রোবট।' বুদ্ধদেবের কবিতায়—'Man's life is a cheat and disappointment / All things are unreal, / Unreal or disappointing.... / All things become less real, man passes / From unreality to unreality' ( T. S. Eliot )। এখানে আমরা বুদ্ধদেবের 'সাবান' কবিতার উল্লেখ করব। এই কবিতায় যান্ত্রিক জীবনের প্রতি বিরক্ত ও বিশ্রব্ধ একজন মানুষ একদিন বাথরুমে সাবান মাখতে ঢুকে আর বেরোয় না। অতিবাস্তবতার কুয়াশায় হারিয়ে যায়। অফিস থেকে ফিরে, বাথরুমে ঢুকে লোকটা 'অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো নতুন সাবানের দিকে— / সাদা ও সুন্দর, গন্ধের আশ্লেষে ভরা নতুন জীবন / চেয়েছিল সে এরকমই পিচ্ছল, নরম, ক্লেশহীন গলে যাওয়া। / চারপাশের হাড়হিম বিরুদ্ধতার কথা মনে পড়লো তার।' দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ায় টনক নড়ল বাড়ির লোকেদের। তার বউ এবং প্রতিবেশীরা এসে দরজা ধাক্কাতে লাগল। অবশেষে ভাঙা হল বাথরুমের দরজা। উদ্বিগ্ন ও কৌতূহলী সকলের অভিজ্ঞতা হল এরকম— 'কোথাও দেখা গ্যালো না তাকে, শুধু বিশাল বড় ও সাদা / নিরেট সাবানের গন্ধে ম' ম' করে উঠলো দশ দিক।' শেষটা কবি স্পষ্ট করেন না বলেই কবিতাটি উত্তীর্ণ হয় নিপুণ শিল্পে।

অ্যাবসার্ডিটির সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে অন্য এক হারিয়ে যাওয়ার বা মৃত্যুর গল্প শুনিয়েছেন রণজিৎ তাঁর 'গ্যারেজ' কবিতায়। 'মোটর-মিস্ত্রির তার মোটরের নীচে শুয়ে একদিন অদৃশ্য হয়েছে।' —কবিতার প্রথম লাইনেই এ-ধরনের এক চমকপ্রদ কিন্তু ভয়াবহ আবহের সৃষ্টি করেন রণজিৎ। বুদ্ধদেবের কবিতায় আছে এক মধ্যবিত্ত চরিত্র, যে সাবানের অনন্ত বুদবুদের মধ্যে মিলিয়ে যায়। আর রণজিৎ-এর কবিতার মোটর-মেকানিক একদিন অদৃশ্য হয়ে গেলে ব্যাপারটা হয় এতই তুচ্ছ যে, তা 'লক্ষ্য করেনি কেউ।' গাড়ির মালিক গ্যারেজে এসেছে এবং 'নিখুঁত স্টার্টের শব্দে খুশি হয়ে',



'মোটর চালিয়ে নিয়ে ফিরে গেছে গভীর ধাক্কায়।' কোনো খবর না পেয়ে মিস্ত্রিরির 'বউ-বাচ্চা তিনদিন পরে এসে / ধুলোর ভিতরে ঢুকে আতিপাঁতি খুঁজেছিল তাকে।' কিন্তু তার খোঁজ পাওয়া যায়নি কোথাও। 'পরে তারা ফিরে গেছে, চুপচাপ।' কবিতার শেষ লাইন মারাত্মক। শ্রম-নির্ভর, ঝুলকালি-মাখা জীবনের তুচ্ছতা আমাদের প্রকৃতই বিদ্ধ করে, যখন রণজিৎ এই নিরীহ মন্তব্যটি করেন—'গ্যারেজে তো এরকমই হয়।' বুদ্ধদেব আর রণজিৎ দু-রকমভাবে একই কথা বলতে চেয়েছেন।

গ

'Our sun is meagre, our loves are cruel and our youth has no youth.'

তরুণ এক জার্মান নাট্যকারের নাটকের এই সংলাপ আজকের পৃথিবীর তাবৎ যুব-সমাজের পক্ষে প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত, আমরা পাঠকের স্মরণে আনতে চাই এলিয়টের 'পোড়ো জমি' কাব্যের তৃতীয় সর্গের শেষ অংশ। যেখানে বৃদ্ধ, অন্ধ, ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা টাইরেসিয়াসের চোখ দিয়ে আমরা পৌঁছে যাই এক যুবতীর ঘরের একান্ত গোপনে। প্রেমের এক দৃশ্য কাব্যের এই অংশে বিবৃত হয়। .....প্রেমের দৃশ্য। কিন্তু কিরকম। প্রেম? যান্ত্রিক প্রেম। যে প্রেমে হৃদয়ের ভূমিকা গৌণ। অনুভূতির নির্বাসন। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ের ক্ষণস্থায়ী আরামই সেই প্রেমে প্রাধান্য পায়। মেয়েটির প্রেমিক এসে পৌঁছয়। খুবই অ-রোমান্টিক চেহারার এক যুবক। 'the young man carbuncular'. স্বল্প-আয়ের একজন কেরানী। দুজনের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়। পরক্ষণেই ধৈর্যহীন ঐ যুবক তার প্রেমিকাকে আলিঙ্গনে জড়াতে চায়। কিন্তু সেই মেয়ে, —'bored and tired',—যুবকের এই আদিখ্যেতা মোটেই পছন্দ করে না। শেষে ধৈর্যের অন্তিমে পৌঁছে যাওয়া ঐ যুবক প্রেমিকার সম্মতির অপেক্ষা না করে তার শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কবির বর্ণনা এরকম: 'Flushed and decided, he assaults at once'. এখানে 'assaults' শব্দটা, কবির ইচ্ছে অনুযায়ী, পাঠকের মর্মমূলে গেঁথে যায়। প্রেম নয়, অহমিকার তৃপ্তি। আদর নয়, বলাৎকার। এই হল নগর-জীবনের ভালোবাসার প্রকৃত ছবি। এখানে ছবিটা আরো গভীর নির্মমতার সঙ্গে সম্পূর্ণ করেন এলিয়ট। যুবকের এই জোর-জবরদস্তির কাছে মেয়েটা নিজেকে ছেড়ে দেয়। 'Exploring hands encounts no defence'—ইত্যাদি। সঙ্গমের পর তৃপ্ত ( কিংবা অতৃপ্ত ? ) ঐ যুবক ঘর ছেড়ে, অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে নেমে যায়। এবং মেয়েটা আয়নাতে নিজেকে দেখে নেয়। অবিন্যস্ত চুল ঠিক করে নেয়। আর গ্রামাফোনে রেকর্ড চালিয়ে দেয়। 'She smooths her hair with automatic

hand, / And puts a record on the gramophone'. 'automatic' শব্দের তুলনাহীন ব্যবহার নিশ্চয়ই পাঠককে বুঝিয়ে বলতে হবে না। যান্ত্রিক জীবনের ফাঁসে বন্দী হয়ে পুরুষ ও নারী দুজনের মনই যান্ত্রিক হয়ে গেছে। কারোর জন্যে কারোর মনে আবেগ নেই। হৃদয়ে নেই অনুভূতির আলোড়ন। জীবনের দাম কমার সাথে সাথে প্রেমেরও আর সেই কৌলিন্য নেই। যেরকম বলেছেন সুনীল তাঁর কবিতায়— 'ভালোবাসা চলে যায় একমাস সতেরো দিন পরে', কিংবা,—'প্রেম যেন মুখ থেকে চলে যায় শরীরের সহস্র আঙুলে।' ষাটের কবি বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ভালোবাসার ছবি এরকম ঃ 'যেমন সঙ্গম আজ হয়ে গেছে কেবলই সন্ত্রাস / ঠিক তেমনি ঢলাঢলি ভালোবাসা নিয়ে— / সংসারে ছড়ায় নোংরা হাওয়া। / ভালোবাসা ভালোবাসা চতুষ্পদে হাঁটে / শহরের ঘরে পথে গ্রামে গঞ্জে মাঠে.....।'

ভালোবাসার এরকম হাস্যকর ও বিকৃত চেহারা ষাট এবং সত্তরের কবিদের হাতে ক্রমশ আরো অবনতি পেয়েছে। কারণ সেই একই। টেকনোলজির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, নগরের জেট-গতিতে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও পাথর হয়ে উঠেছে। ক্রমশ সে নিস্পৃহভাবে এবং জটিলভাবে ভাবতে শিখেছে। সভ্যতার এই প্রগতি তার জীবনে আনছে শুধুই উদ্বেগ, অভাববোধ, আদর্শ ও মূল্যবোধের ভাঙচুর, সম্পর্কের জটিলতা এবং পরিবেশ-দূষণ। আধুনিক প্রেমিক এখন বিলাপ করেন এইভাবে—'রক্তে বিষ মিশে আছে প্রিয়তমা' (ভাস্কর চক্রবর্তী)। 

সত্তরের কবিতাতেও প্রকাশ পায় এই অপ্রেম। কিংবা প্রেমের ন্যাকামির প্রতি উন্নাসিকতা। এঁদের কবিতা পড়লে মনে হয়, ভালোবাসা বিষয়ে এঁরা সম্পূর্ণ মোহ-মুক্ত এবং পরিণামদর্শী। বিশ্বের উচ্ছ্বাস নয়, বিচ্ছেদের শীতলতা স্ফূর্তি পায় এঁদের কবিতায়। উদাহরণ ঃ (১) 'হাইকোর্টের একেবারে অন্ধকার ঘরটিতে গিয়ে পেলে / আইনের শাঁখা, আইনের নোয়া, সিঁথিতে আইনের সিঁদুর' — (ব্রত চক্রবর্তী)। (২) 'তাহলে এখানে তোর চতুর্দিকে শুধুই পুতুল / সুতো ছাড়া টান নেই, ছুতো ছাড়া ভালোবাসা নেই' (রণজিৎ দাশ)। (৩) 'মানুষের কোমর আর তেমন সোজা নেই, আগেকার মতো / প্রত্যেকের ছোট মেয়ে ভালোবাসার বিবাহের পর ক্রমশই ভালোবাসা-হীন' (অরুণ বসু)। (৪) 'পার্কে এসেছো, কিন্তু এই সন্ধ্যা ঋণছায়াময় ; তোমাদের বলি— / যতো পারো চুমু খেয়ো, লোকচক্ষু ফাঁকি দিয়ে, সুস্বাদু জিহ্বায় / কোন কথা নয়, কোনো স্মৃতি কিংবা স্বপ্ন-টপ্ন নয়।' স্বপ্ন নেই। প্রেম নেই। বেঁচে থাকায় উৎসাহ নেই। উচ্চাশা নেই। শুধু হতাশা আর হাহাকার। 'নার্ভতন্ত্রের মধ্যে সার সার দাঁড়িয়ে হতাশার ডেঁয়ো-পিঁপড়ে' (ব্রত চক্রবর্তী)। 'বিশ্বতরুণের দৃষ্টিপথে



আজ আর কোনো আদর্শের মিনার নেই।' —সমাজবিজ্ঞানীর এই বক্তব্যের সমর্থন পাই সত্তরের আর এক তরুণের কবিতায় ঃ 'ভাবতে অবাক লাগে, সেই কবে উনিশশ' পঞ্চান্নয় আমি জন্মেছি / অথচ আজ পর্যন্ত একটিও যথার্থ রাজনৈতিক দল আমার চোখে পড়েনি, / একটিও যথার্থ ভালোবাসা কিংবা একটিও যথার্থ বন্ধু / আমার লক্ষ্যগোচর হলো না— / শুধু রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বেড়ে গেছে, / ভালোবাসার সংখ্যা বেড়ে গেছে, / বন্ধুর সংখ্যা বেড়ে গেছে' (সুজিত সরকার)।

শহরের অলিগলিতে, রাস্তায়, ফুটপাতে, পার্কে, রকে সর্বদাই বিপথগামী তরুণদের খিস্তি-খেউড়। এরকম আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় যৌনতার প্রতি এক জান্তব আকর্ষণ। সমাজবিজ্ঞানীর আর একটা মূল্যবান মন্তব্য উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না ঃ '.....আজকের যৌনজীবন de-eroticized হয়ে গেছে, মানুষ হয়েছে শিশ্নোদর পরায়ণ এবং যৌনজীবন হয়েছে কেবল শিশ্নকেন্দ্রিক।' এরকম ভাবনাই স্ফূর্তি পায় রণজিৎ-এর এই কবিতায়—"একটি যুবক তার স্বপ্ন অতিক্রম করে গোলাপ-বাগানে ঢুকে নগ্ন হয়েছিল / মুখোমুখি অন্ধকারে কুপ্রস্তাব করেছিল গোলাপের কাছে— / 'কে বেশী সুন্দর' বলো, তুমি, না আমার এই প্রস্ফুটিত শিশ্নমুখচ্ছবি'—।

অপ্রেমের এই আস্তাকুঁড়ে সকলের অজান্তে যারা রক্তবীজের মতো বেড়ে ওঠে তাদের পারিভাষিক নাম—লুম্পেন। এই লুম্পেনগোষ্ঠীর কদর রাজনৈতিক নেতাদের কাছে খুব বেশী হলেও, এদের কোনো সামাজিক স্ট্যাটাস নেই। তাই যেন নিজেদের অস্তিত্বকে প্রচার করতেই এই লুম্পেন বা মস্তানের দল নাশকতামূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়। খবরের কাগজ পড়ে আমরা জানতে পারি, কলকাতা ও শহরতলীতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এইসব মস্তানগোষ্ঠীকে সামলাতে পুলিশ ও প্রশাসনকে কিভাবে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। আজকের এই দুর্নীতি-জর্জরিত সমাজে বাস করে কবিদের পক্ষে স্বপ্ন এবং আদর্শের চর্চা করা প্রায় অসম্ভব। যেহেতু কবি একজন দ্রষ্টা, তাঁর সৎ চোখে ধরা পড়ে এই লুম্পেন সাম্রাজ্যের বিক্রম। রণজিৎ-এর কবিতায় এরকম একজন লুম্পেন কথা বলে ঃ 'শান্ত আবেদনগুলি অগ্রাহ্য করেছো, আমি তাই / একা একা লুম্পেন শহরে / অজ্ঞাত জলের মত বেড়ে উঠি।' এরাই জানায় 'হিজড়েদের নাচের ভিতর আমাদের জন্ম, / আমাদের শরীর আদালতের কঙ্কাল।' এবং 'সত্য কী, আমরা জানি না। অথচ মিথ্যাকে জানি, নির্ভুল, নিজের ছায়ার মতো।' তামাশা তুমুল জমে ওঠে যখন রণজিৎ-এর 'রুস্তম', যে ঘটনাচক্রে, 'দারোগাবাবুর ছোট ভাই', —কলেজের ছাত্রীর সামনে এসে বলে— 'সম্পূর্ণ মনের জোরে চুমু খেতে এসেছি তোমাকে।' হাংরি আন্দোলনের কবি মলয় রায়চৌধুরীর কবিতাতেও আমরা লক্ষ্য করি কান্ডজ্ঞানহীন এক মস্তান বেহায়ার

মতো চিৎকার তোলে—'সামলাও নিজস্ব স্ত্রীলোক বাঁদি সোনাদানা ইণ্ট দেবতা / ফেরেবের কাগজপত্তর নথি....।' 'মেশোমশায় পর্ব' নামে এক পরীক্ষামূলক কবিতায় মলয় হাজির করেন আজকের দুর্যোধনকে। —যে বিপুল হিংসা ও ক্রোধে, অন্ধ মত্ততায় মাঝরাতে শহরের মানুষের ঘুম ভাঙায় এইভাবে ঃ

'যুধিষ্ঠির
আব্বে পান্ডবের বাচ্চা যুধিষ্ঠির
বহুতল বাড়ি থেকে নেমে আয় গলির মোড়েতে
নিয়ে আয় ল্যাংবোট কৃষ্ণ ভীম বা নকুল কে কে আছে
পেটো হাফিস্টিক ক্ষুর সোডার বোতল ছুরি সাইকেল চেন
বলেদে দ্রৌপদীকে আলসে থেকে ঝুঁকে দেখে নিক
আমার সঙ্গে আজ কিছু নেই কেউ নেই....।'

কৃতজ্ঞতা ঃ
মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত ঃ বিদ্রোহ বিনয় ঘোষ
দ্বিতীয় ভুবন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
ষাট দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতা পবিত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত



## অমিতাভ গুপ্ত

### হেতু-অহেতু

বাঁকা পথটির সোজাসুজি চলা, সোজা পথটির বাঁকা
চলনে বলনে, মনে হয় আজ ঘরে ফেরবার আগে

ঘরই আমার ভিতরে ফিরবে। আমার ভিতরে? যদি
ধু ধু বালি থাকে? মরুভূমি থাকে? মরা ক্যাকটাস থাকে

তাহলে ঘর কী ঘর খুঁজে পাবে? সোজাপথে বাঁকাপথে
যেভাবেই হোক কীভাবে আমাকে ছাড়িয়ে সে চলে যাবে

বরং প্রতিটি বালুকার কণা, প্রতিটি পাতার কাঁটা
প্রতি-মরুভূমি দিয়ে মর্মরপাথরকে গড়ে তুলি

অথবা, অহেতু প্রস্তুতি এই, সবপথ শেষ হলে
কোন্ সে গভীর গৃহসজ্জার ঘরের দুয়ার খোলে

## প্রমোদ বসু

### ফাঁক

এই রাত্রি শুধু রাত্রি হয়ে থাক।

ক্ষত ভুলে যাই, জ্বালা ভুলে যাই,
বিছানা উপুড় করে এসো, দেখি
প্রেম ছিল কি না।
নইলে শরীর শুধু গরল বৃথাই!

যাবার যা ছিল গেছে, যাক।

দেহ শুধু দাহ্য দেহ হয়ে আছে!
হৃদয় তল্লাস করো, এসো, দেখি
প্রেম ছিল কি না!

ভাল লাগে মনে-মনে এতখানি ফাঁক?

## সব্যসাচী দেব

### ভাষা

আমার কোথাও যাওয়া নেই
শিকড়ের টান থেকে খসে যাচ্ছে
আজন্মমৃত্তির ছায়া
তবু দেখা হলো

পাহাড়ের ঢাল থেকে উঠে-আসা অলীক কুয়াশা
ঢেকে দিচ্ছে আমাদের নিঃশব্দ শরীর
তবে আজ কথা বলি,
কথা বলি যে-ভাষায় আঙুল জড়িয়ে ধরে
দূর ছায়াপথ থেকে ঝরে-পড়া আলো
শুরু হোক আমাদের থেমে-যাওয়া রূপকথা আজ

আমার কোথাও যাওয়া নেই
আজ এই টুকরো টুকরো কথা ছুঁয়ে দেখি
জেগে ওঠে ভাষা
দেখি, অন্ধ রাত্রি জুড়ে ফুটে ওঠে জুঁই

## সংযম পাল

### ভূমিকা

এ'সবই আমার কাব্য। শান্ত হ'য়ে কথা বলা, কখনো অস্ফুট।
কখনো মনের মধ্যে পাকে পাকে তৈরি ক'রে মিষ্টি লতাকে
কাঁপ দিয়ে ওপরে ওঠানো। ছাদের ওপর থেকে আদিগন্ত সবুজ সম্ভার
দেখতে দেখতে ব'লে ওঠা ঃ কি জন্ম পেলাম! জ্ঞানী, ভাগ্য আমার!
যিনি দিয়েছেন তাকে আমি কি ফেরৎ দেবো? শুধু নীল শুকনো কালিতে
ব'লে যেতে পারি মৃদু একটি আশীর্বাদে সুখী ছিলো একটি জীবন।



## ব্রত চক্রবর্তী

### আছি তো আছিই

যে গ্রাহ্য করে, তার সংসার গুছোই।
উদাসীন সঙ্গমের চেয়ে মৃত্যু ঢের ভাল।

আছি তো আছিই। উঁচু মাথা
রাখতেই চাই। তবু হাঁটু মুড়ে বসবার
যে কোন সুযোগ পেলে নেবো।
খয়েরি কালিতে লাল, লালেতে হলুদ,
তার নামে সাদা পাতা ভরিয়ে তুলব।
কিংবা মরব, যদি সে প্রীতির মাপে
মৌন কিছু অবহেলা রঙ করে কৌশলে গছায়।

আছি তো আছিই। দম মারো দম এই
জীবনে জীবন। গ্রাহ্য করো, মুখে জুতো নিয়ে
রাস্তার পালিশওলার কাছে বৃষ্টি ভেঙে যাব।
না করলে বিখ্যাত সূর্যাস্ত হবো তোমার আকাশে!

## রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

### কবিতার কথা

একশ একুশ তলা গদ্য উঠে যখন শাসায়,
যখন পদ্যের বস্তি তারই নিচে হত্যে দিয়ে থাকে,
তখন কি সূর্য-চন্দ্র এ-বিশ্বের গ্রহ-তারকায়
কেন্দ্রীয় আয়োগ হয়ে ঋণ দিতে পারে যাকে তাকে?

দুইশ বাহান্ন বর্গে বর্ণভেদে সর্বকুল নেই,
প্রত্যেক স্তবক চায় স্বাতন্ত্র্যের কিছু গুণমান;
তাই স্বরূপ শূন্যতাই—স্পেস বলে অভিহিত সেই
মেরুবিভাজনে সৌম্য কবিতার নিভৃত বিজ্ঞান।

ওষ্ঠপুটে যত ভাষা জন্মে থেকে বেপথে গোঙায়,
দিনরাত্রে যত শ্বাস বায়ুপথে যাতায়াত করে,
ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রান্তে এসে তারা একটি ফণা ধরে—
ছোবল মনস্থ করে হিম চোখে অরূপ জ্যোৎস্নায়।
চলন সপিল তাই ; গমন ঃ রে স্পর্শকাতরতা,
জল সত্য, ধর্মে সেইমত প্রতিকবিতার কথা।

## দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

### ওয়েসিস

রোমের প্রাচীন মধুবর্ণ পাথরের বেদীতে বসে
ওদের বাজাতে হয়।
চাঁনে বেহালার মত একটি শিশু,
ছোট্ট ডুগি তবলার মত একটি শিশু।
তারগুলো সব মোমপালিশ আর বাঁধা।
সোনালি গোলাপে মোড়া ঘুম
ভাঙিয়ে দিলেই ধারাবতী গোলাপী মোমের নদী।
ওদের সান্নিধ্য, রু ট্রেনে বসে পপলারের বনে চোখ রেখে চলা।
সবুজ ঝাউচুল অবহেলে পড়ে আছে পিঠে।
জড় ডানাগুলি খুলে ওদের চুলের লাল নীল নরম আভা
মেখে নিলে প্রৌঢ় কাঠের বাঁশিটি আবার পূর্বরাগ বাজাবে।
এইসব শিশুদের স্বর অ্যাপোলোদেবের সিংহাসন নাড়িয়ে দেয়।

দহনের পৃথিবী থেকে, এসো, আমরা ওদের কাছে যাই।

## কৃষ্ণা বসু

### চন্দ্র-পুরাণ

লোকে বলে চাঁদে পাওয়া মেয়ে নাকি আমি,
লোকে বলে লুনাটিক, ক্ষেপী, আলাভোলা,
যা বলে বলুক লোকে, আমি ঠিক জানি



চাঁদ খেয়ে চাঁদ মেখে চান্দ্র মাস ছুঁয়ে
কিশোরী বয়স থেকে ডুবে আছি আমি,
চাঁদের সংসর্গ এসে সখ্যতা করেছে,
হাঁটু জল নদীটির মধ্যে চাঁদ ভেঙে
গুড়ো হয়ে আছে, চাঁদ নিয়ে সেই নদী
হয়েছে জলধি, চাঁদ মেখে এ সারণী
গান হয়ে গেছে ; সমুদ্রের নীল থেকে
নীল নিয়ে চাঁদ তার অলৌকিক নীল
চালচিত্র বানিয়েছে, চাঁদ খুব গোল
আর রমণী কাতর হয়ে ঘিরে নিচ্ছে
ধুয়ে দিচ্ছে ভরে দিচ্ছে মুগ্ধ বোধ রীতি,
চাঁদ এসে হাত ধরে নিয়ে গেছে আহা
বাড়ির বাগানে ফলসা ঝোপের পাশে।
পুজোর প্যান্ডেল ফাঁকা করে দিয়ে
চাঁদ এসে নিয়ে গেছে দেবীর প্রতিমা,
চাঁদ এসে আলপিন দিয়ে গেঁথে গেছে
বিরহিণী নক্ষত্রের গায়ে হৃদয়ের
সুসংবাদ, হৃদয়ের দাবি-দাওয়া সব।
চাঁদ এসে যাচ্ছেতাই করে দিয়ে গেছে
ধ্বংস করে দিয়ে গেছে কুমারী হৃদয়,
চাঁদ এসে লুঠ করে নিয়ে চলে গেছে
যৌবন ফসল আর বালিকা বিস্ময়।
তবু চাঁদ তবু চাঁদ তবু চাঁদ চাই।
চাঁদ ছাড়া পরিত্রাণ নেই কোনোখানে,
মাথার ওপর দিকে ঈশানের কোণে
গাছেদের শীর্ষদেশে চাঁদ রেখে হাঁটি,
স্বপ্নের পাড়ার দিকে ঘুম ভেঙে উঠে
দেখি চাঁদ এসে বাল্য-সখাটির মত
ঘরের দুয়ারে বসে আছে অপেক্ষায়।

## বিপুল চক্রবর্তী

### ময়লাগাড়ি

একটা বোটকা গন্ধ আটকে আছে

ভোর
দেখ, সদ্য ফুটে ওঠা মেয়েটি
নাকে মুখে রুমাল
এরই মধ্যে কেমন মুষড়ে পড়েছে

ওকে সইতে বলো

ওকে বলো
এই কটু গন্ধ এই ময়লাগাড়ি যত দূরেই যাক
আরো ঢের ঢের দূরে আমাদের যাওয়া

## মৌ দাশগুপ্ত

### দেওয়াল

এই তার নিজস্ব জগৎ
দশ বাই পাঁচ এই দেওয়াল  এই চিত্রপট।
তৈরি হতে থাকে এক আটলান্টিক সাগর
বাঁপাপাণি মুছে গিয়ে
জন্ম নেয় ক্রমশ চিতোর দুর্গ  উঁচুনিচু বালিয়াড়ি
বৃষ্টি-জল চুঁয়ে চুঁয়ে নেমে
ভিজিয়ে তুলছে সেই জগৎ  নিরক্ষরেখা
আর ক্রমাগত বদলাতে থাকা অনুভূতিমালা
এরপর জন্ম নেবে কোন্ মুখ—
অপেক্ষায় অপেক্ষায় কাটে একটি একটি রাত
আবেগ সিঞ্চনে আরো ভিজে ওঠে দেওয়াল

এই বর্ষা ঋতু পার হয়ে যেতে
কখন অজান্তে চুনকাম হয়ে গেলো
সে মানসসরোবর
এখন দাঁড়িয়ে শুধু সাদা মুকে নিছক দেয়াল।



## অমিতাভ মিত্র

### চারাগাছটির কথা

রাস্তা পিছল
সাবধানে ফেলো পা
চারাগাছটিও
সূর্য দেখছে না।

বলি, 'বেড়ে ওঠ্
অরণ্যে তুই একা
কবে যে আবার
হবে আমাদের দেখা!'

নেপথ্যে শুধু
জলের শব্দ ক্ষীণ—
নির্ভয়ে তাই
পার হই দু'দিন।

গল্প শোনাই
চারাগাছটিকে ডেকে,
বলি মানুষতো
অভিজ্ঞতায় শেখে—

অরণ্যে সেই
অচেনা অজানা-নাম
দীঘিটির কথা
আমিই কি জানতাম!

## গৌতম দাস

### লোকাচার

ঝড় এলো। খুলে ফেলি ঘরের সমস্ত দরজা জানলা
ঝড় আমার ঘরের অন্ধিসন্ধি জেনে নেয় আজ
মায়ামাকড়সার ব্যূহ ভেঙ্গে দিয়ে সর্বনাশ দিয়ে
এলোমেলো কথকতা আরো একটু এলোমেলো করে

মাথাভর্তি ধুলোলাল বহুদূরে দেশের ভ্রমণ
সান্ধ্যঘন্টাধ্বনি নিয়ে ঢুকে পড়ে অন্তর অবধি

জ্বেবলে দি একটি প্রদীপ। আর ওই জ্বলন্ত প্রদীপে
ঝড় পদ্মাসনে বসে, শঙ্খ বাজিয়ে চলে ললনা

## পিনাকী ঠাকুর

### পদপল্লবমুদারম্

কেন ঘাড় নীচু কেন দেখতে পাওনি এই চোখে জ্বলে
বাষ্পময় ভয়
তবু নত করো মাথা, জানোনা ভুবনজোড়া সাহসী বিস্তারে কোন
পরিত্রাণ নেই
বোবায় ধরেছে জিভ, শাস্ত্রীয় পুজোর ফুলে অভিজাত কেঁদে ওঠে
আদবী সভ্যতা
ধ্বসের আগেও ছেঁড়া নামাবলী ভেদ করে বলে যাই প্রথামতো
মিথ্যা সুবচন!

সময় যতোই আজ চুলের কালোয়, ত্বকে বাদামী
অর্দ্ধদিন হাসে
ওরা যতো থুতু দেয় জনগণমন হয়ে নিজেকেই ধুলো হাতে
থাপ্পড় কষাই
শুধু একবার, আমি, গীতগোবিন্দম থেকে পোকাধরা
পাঁত ঝরাপাতা
আমার মৃত্যুর রাতে সভ্যের অজানা শ্লোক তোমার ওই
পায়ের সবুজে!



## সুদীপ গঙ্গোপাধ্যায়

### হয়তো এখানেও

হয়তো এখানেও বৃত্ত রচিত
ম্যাজেন্টা রঙে।
বিসর্গের মত মুহূর্তের বিন্দু বিন্দু
অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ঘড়িতে
ডুবুরী লাফায়....
আজ ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৯১ ঃ শনিবার, রাত ১১টা ২৯
ঠাসা শীতে উঠোনের ত্যারছা আলোয়
একলব্য মনে ম্যাজেন্টা রঙে

## নাসের হোসেন

### যে আসছে

সমস্ত শিরদাঁড়ায় ব্যথা নিয়ে তোমরা এখনো
দাঁড়িয়ে রয়েছো কার প্রতীক্ষায়?
মেধার কপিকল বেয়ে উঠে আসি—
সংগমহেতু পায়ের সঙ্গে পা, মুখের সঙ্গে মুখ
নিটোল স্তন ডুবে যায় হাতের আড়ালে....

অন্ধ! এখনও দাঁড়িয়ে কার অপেক্ষায়?
শাঁখের ও ঘোরের মধ্যে কেঁপে ওঠে
সুমিতা ঃ
পেটে যে আসছে ওগো
সে আমাদের নয়, ওদের ওদের!

## দিলীপ ভট্টাচার্য

### দ্বিধা

বাঁশি বাজছে,
ভীষণ কোলাহলে শুনতে পাচ্ছি না
বাগানে ফুল ফুটছে
তবু গন্ধে আকুল হচ্ছে না প্রাণ।

দরজা খুলে বাইরে আসি
বাগানে ফুল, আকাশে জ্যোৎস্না
দূরে অন্ধকারে জোনাকির আলো
ভাবি নিজেকে মানিয়ে নেবো।

ঠিক তখুনি গেট খুলে এগিয়ে আসে ব্যস্ত পায়ের শব্দ।

## পৌলমী সেনগুপ্ত

### ক্যাম্পাস—৪

অতবড় ক্যাম্পাসে লাল ছাড়া নীল ফুল ছিল না কোথাও

তারা দিয়েছিল সব ধূসর মেঘের প্রশ্ন
উত্তরবিহীন, একমুঠো শব্দ নিলে
পলকে জমাট বেঁধে নেমে আসে
সাম্প্রতিক চিঠি

ফুলে ঢাকা পথঘাট, শরীরে পিছল
পদচিহ্ন মুছে গেছে তুষারে তুষারে
সূর্যই নয় শুধু, তোমরাও পূর্বদিকে ওঠো
কিন্তু ভোবোনা তাই পশ্চিমে অসহায় আলো
লাল ছাড়া নীল ফুল ফোটেনা কোথাও

দ্বীপান্তর ভাবি তাকে
এইসব টুপটাপ স্মৃতিপাত মিশে যায় ছন্নছাড়া জলে



## কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

### হেমন্তের সুর

হেমন্ত না পড়লে
হেমন্তের গান গাওয়াই যায় না।
খুব মৃদু,
অপরূপ অনুভূতিগুলো....
বারান্দা-ভরা রোদ,
মাঠভরা ধান।
হেমন্তের ব্যস্ততা নিয়ে পড়ে থাকে যারা,
পরে তারা ভুলে যায়
হেমন্তের গন্ধ,
খেত-খামারের গল্প।

বারান্দার সুখোষ্ণ মেঝেয়
উপুড় হয়ে পড়ে থাকার অনুভূতি,
পুরোনো দিনের গানের কলির মত
মনেই পড়ে না।
শুধু একটিবার ধরিয়ে দিলেই হয়,
কুয়াশাহীন রাত্রির আকাশে
রাজহংস তারাবলির মত
একটু একটু করে জ্বলে ওঠে
স্মৃতির মুখ।

হেমন্ত না পড়লে
হেমন্তের গান গাওয়া যায় না।
তোমার সুর না শুনলে নীলাঞ্জন,
বলাই যায় না
কেমন আমার আকাশ, ভালোবাসা।

## শবরী ঘোষ

### সময়ের ভূত

সেদিন ছিল জলে স্থলে প্রচণ্ড গর্জন
সেদিন ছিল ঘরের কপাট গুঁড়িয়ে ফেলার খেলা
সাগর সেদিন পেয়েছিল হোলির নিমন্ত্রণ
ভুবনডাঙায় বসেছিল সংক্রান্তির মেলা।

*

দিনের অগ্নিসংস্কার করে রাত্রি আসে, কে না জানে ?
রাত্রি এল।
মলিন রাত্রি জলচ্ছায়া ঝাপসা করে দিল রঙীন দিনের
বাঁধানো ফোটোগ্রাফ। চোখ থেকে দৃষ্টি গেল, মুখ থেকে
ভেঙে পড়ল আশ্চর্য হাসিটি—যেন বোঁটাভাঙা হলুদ সূর্যমুখী
ফুল। কালো ফ্রেমের কফিনে আটকা পড়ে রইল
পাঁশুটে ধুলো, আর আয়ুহীন সময়ের হিমঠাণ্ডা শব।

আমরা সকলে জানি, সময়ের হাতে এক গোল চাকা আছে
সবাই বুঝেছি, ঈশ্বরপুত্রের মত
সময়ও কবর থেকে পুনরায় জাগরিত হয় ঃ
সেই সব জেগে ওঠা দিন
আফ্রিকার হরিৎ প্রান্তরে যেন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল উড়ন্ত জেব্রা
সমুদ্রের নীলাভ রৌদ্দুরে যেন মগ্ন অ্যালবাট্রস
নারকেল বনশ্যাম উদাসীন প্রশান্ত লেগুন
বসন্তসেনার নাচঘরে শতদীপ হীরের লণ্ঠন....

*

সময়ের ভূত এসে কানে কানে বলেছে আমাকে ঃ
মোমবাতি নিভে যায়, আলো জেগে থাকে।



## অরূপ আচার্য

### জল-প্রমোদে নাচি

একটি নদী পাশেই ছিল
একটি ফড়িং ঘাসেই ছিল শুয়ে
আমি তাকে ধরতে গেলাম নুয়ে
ফড়িংটা কি উড়তে থাকে নদীর ওপর দিয়ে ?

নদীর পাশে দাঁড়াই
পা পিছলে জটিল জলে হারাই
এই পৃথিবী কেবল হাতড়ে বেড়াই

যে মুখ আমায় নামিয়ে ছিল জলে
সে মুখ আমায় ভাসিয়ে দিল জলে

আমি তবে জলেই মিশে আছি
জলের ভিতর জল-প্রমোদে নাচি

জড়িয়ে ধরে জল-জিয়ন্ত শাড়ী
জলেই এখন আমার ঘরবাড়ি ?

## জহর সেনমজুমদার

### চন্দ্রভস্ম

চন্দ্রভস্ম। আমাদের নির্জনতা ও ঘনিষ্ঠ এই জাগররাত্রি
এমন বিদ্যুৎ
চোখ মুছিয়ে দাও। শিরা ; কালো কালো শিরা উঠেছে
চোখের নিচে। যেনবা মই। কূপি নিভে যাবার পর বলো
আজ সারাদিন বাড়িতে কি হয়েছে। দাদার সঙ্গে কি
বৌদির ঝগড়া হয়েছিল ? না-হলে সাঁড়াশি অমনভাবে
চোখের মধ্যে ঢুকলো কি করে ?
মা কাপড় কাচবার সময় রিন্ সাবান ব্যবহার করেনি ব'লে
এতো রাগ জমলো পুকুরের ভেতর ? এইজন্যই তো বাড়িতে

আসিনা। সারাদিন ঘ্যানর ঘ্যানর। কাপড় হলুদ ক'রে বসে আছো!
কালকে বাচ্চাটাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেখাবো চন্দ্রভস্ম। এখন
এসো দেখি। লেপের তলায় এতো সবুজ দুর্বোঘাস কেউ রাখে?
এই জন্যইতো মাথা গরম হয়ে যায়। খালি এক কথা। ভয় করছে।
ভয়ের নিকুচি করেছে। চন্দ্রভস্ম দেখতে সবার তো
একদিন না একদিন ইচ্ছে হবেই। কুপি নিভে যাবার পর
দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন চোখ তোলো। হাই তুললে চাঁটি মারবো।

## নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

### কোন সবুজ সিঁড়ি

হাঁরেকুচি বৃষ্টির মধ্যে নেমে গেছে অনেক সবুজ সিঁড়ি
যাব কোনদিকে? মেঘের কালো বিদ্যুৎকে বিদ্রূপে ঢাকছে নিয়নদ্যুতি
এতগুলো দরজা, আমার ঘর কোথায় যেন ছিল?

ভীষণ আমার, রুদ্র আমার, নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার
রক্তের চেয়েও এত গাঢ় লাল একটা পথ ধরে হারানো বান্ধবীরা
কেন যে অনুতাপে গাইছে, যখন ছিলাম অন্ধ....

পাইনি কি আনন্দ? নিয়নদ্যুতিকে ডাকছে কালো বিদ্যুৎ
সুড়ঙ্গকে ডাকছে পাহাড়, নদীর জোয়ার ডাকছে সমুদ্রকে
আমার মেয়ের চেয়েও সুন্দর একটা মেয়েকে ডাকছে আমার কৈশোর
গোপন অহংকারে যাব কোনদিকে?

'এবার থেকে তুমিই আসবে আমার কাছে'
বনমর্মরে ধ্বনিত হচ্ছে এমন মৃত্যুঞ্জয় ডাক
পিতৃপুরুষকে ডাকছে অমর সন্ততি

আমার চারদিকে এত নির্জন হাঁরেকুচি বৃষ্টি, মেঘ দেখতে পাই না
কোন সবুজ সিঁড়ির শেষে রয়েছে আমার ঘর?



## পিনাকী ঘোষ

### অষ্টধা

মৃত্যু সেই মরদের নাম
জন্ম যার বিছানায় ওঠে

ঘিরে কালো অক্ষরের থাম
ছায়া আর কল্পনারা জোটে

সন্ধ্যা আসে দিন চলে যায়
কাঁপে আয়ু অজপার ঝড়ে

পুরঞ্জন দশটা-পাঁচটায়
অপার্থিব ছোটাছুটি করে

গলিত গল্পের স্রোতে ভাসে
জ্যান্ত শব তোমার আমার

পড়ে থাকে বিকেলের ঘাসে
হে তমোহা, বাড়ি ফেরবার

কচি ইচ্ছা, টিপসইয়ের মত
ওঠে চাঁদ, কলোনীর ছাদে

না-বলা কথার গূঢ় ক্ষত
কাগজের শাদা কান্না কাঁদে

## অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়

### মূর্ত অতীত

"মনে পড়ে আজ...."
রায়দীঘির পাড়ে অমলতাস ঘিরে
কামরাঙা সন্ধ্যা নামতো মৃদু পায়ে।
বাঙ্ময় নীরবতায়
বাতাস স্তব্ধ হতো দেওদারে,
অবুঝ কাঙালপনা
দলা পাকাতো গলার কাছটাতে।

"আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে...."
পারি না—
গভীর মৃদুভাষ, রুমালের বকুল
এক অসহ্য ভালোলাগায়
দাপাদাপি করতো বুকের মধ্যিখানটায়
তবে কি—
আটান্নর স্থবিরতায়
সপ্তদশী ব্যাকুলতা বড়ই বেমানান ?

## চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

### রেডক্রস

এভাবেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ভেবেছিলে ! যখন, চুনি কোটালের গল্পে শহর কলকাতা তোলপাড় আর রাত্রির বাসস্ট্যান্ডে একটিও মেয়ে নেই, পাহারা রয়েছে। যখন, নাখোদা মসজিদের ছায়া ডানচোখে, বামচোখে রামমন্দিরের ফুটপাথ আর ততদিনে তোমার বন্ধুরা সব দ্বীপ থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভুলে যাও সামায়িক খিদে ও তৃষ্ণার কণ্ট। ভুলে যাও ক্রমশ কঠিন হলো চড়াই উৎরাই, বাকি পথ। এভাবেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ভেবেছিলে ! এই ভিক্টোরিয়ান প্রেম, হাসি, গান, সন্ধেবেলার পে-ক্লিনিক



## অমিত আদক

### আত্মপ্রত্যয়

মাছের শরীর থেকে সরে গ্যাছে সবটুকু জল
বিক্রেতার কি অদ্ভুত চাতুরতায়
একের রক্তে ভিজে যাচ্ছে আর এক
অথচ
হিমশীতলতা বয়ে বয়ে আমি বড় ক্লান্ত

গতদিনে রাতভোর বৃষ্টির অনুকরণ দেখতে দেখতে
স্বচ্ছ তাপবোধ কিভাবে ধুয়ে গ্যাছে
অবসর দেয়নি সময় সেটুকু জানার

সরল থার্মোমিটার অতিক্রম করেছে উষ্ণরেখা
জ্বর বাড়তে বাড়তে

মাছের সবটুকু স্বাদ কাকের ছিটকে পড়া লোভ থেকে
আমি সরিয়ে নেবই

## অর্ণব সাহা

### সিগারেলা

উড়ন্ত সিলুয়েট। মাঁবিড পালক আর সঞ্চারিত বৃষ্টিবিন্দুগুলি
ক্রমেই প্রণত। চুপ ! সাইরেন নেমে এল তেজস্ক্রিয় হাঁসেদের
ছড়ানো ডানায়....বুকের আলোকদানী দুলে ওঠে স্ফুলিনময়
এবং মাতাল হাওয়া—বসন্তের মত্ত সমীরণ ঐ মশারীর দেহে।

আমার আয়তনীল মশারীর চতুষ্কোণ সীমা আজ হারিয়ে
ফেলেছি শুধু পুরোনো ক্যালেন্ডার উড়াল দিয়েছে সারারাত আমি
ভুলে যাচ্ছি সেই নাম ভুলে গেছি সেই মুখ কিছুতেই আসছে না
মনে—কেমন সে দোলাচল কতোটা গন্ধে তার রুমালের সুতোগুলি
বিজ্ঞাপিত ছিল। বাস্তিল আক্রান্ত ; তবু,
অ্যালিয়েনেশন থেকে পরিচ্ছন্ন টের পাই বিভক্ত হয়ে গেছে
প্লাজমা ও প্লায়ুকোষ....গুপ্ত এক কুঠুরীর গর্ভের নীচে

রুশোর নিঃশ্বাস, জল, পচে-ওঠা মৃতদেহ, অন্ধকার, জল—
ভেনাসের জন্ম তবে এমন স্তব্ধ এক মুহূর্তেই সম্ভব ! অসম্ভব নয়
আজ আমাদের জেগে ওঠা। মোহিনী সিন্ডারেলা, আয় বোন,
অদূরে রম্বস-আকৃতির মেঘশীর্ষে, আয়, উঠে যাই....

## রুদ্র পতি

### জাগরণ

বাতাসে জলের গন্ধ ভেসে আসে, জল-শব্দ
বীজগুলি আলোড়িত ক'রে
এইখানে সূর্য ওঠে নদী তীরে
মানুষের প্রাচীন বসতি।

এইখানে হাওয়ারা আসে
পরাগে নির্মাণ লাগে
পূর্ণিমার চাঁদ আজ কলঙ্ক-রেখার নিচে
হেঁটে যায় কাছে আসে
শিহরিত দুইটি শরীর।

বাতাসে জলের গন্ধ ভেসে আসে, জল-শব্দ
মেঘে মেঘে আজ বুঝি মাদল জেগেছে।

## সব্যসাচী সরকার

### জিজ্ঞাসা

আরও নিরানব্বই হাত দূরে আলোকচিহ্ন, অতীতের প্রেক্ষাপট।
রেলের জানলা দিয়ে দেখছি। ওখানেই শায়িত কি
আমার পূর্বপুরুষ ? হে আমার পূর্বপুরুষগণ, তোমরাও কি
পাখী ধরবে বলে পার্কস্ট্রীটের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলে
আর পকেট থেকে টুপ করে গলে গিয়েছিল মস্ত একটা
দুপুরবেলা ? তোমরাও কি কফির কাপের পিছনে খরচ



করেছিলে তিনশ পঁয়ষট্টিটি খুচরো ঘটনা ? তোমরাও
কি কড়া নেড়েছিলে স্বর্গের দরজায় এবং ওরা ওইখানে
মানে সেইখানে বারবার চিমটি কেটেছিল ? তোমারও কি
২/৩ অংশ ওরা ঝুলিয়ে রেখেছিল মাংসের দোকানে ?
উল্কি দিয়ে পিঠে এঁকেছিল খিড়কির দরজা ? বলতেই
হবে আজ সত্যি ঘটনা—তোমারও কি সামনে ছিল
সাদা কাগজ আর তার উপর এসে নেমেছিল
অহংকারী ইউ. এফ. ও ?

## শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

### উপকূল

মাথায় সবুজ স্কার্ফ তুমি একা হেঁটে যাও বেলাভূমি ধরে
আমার ছোট্ট ডিঙি তখন ঘুমিয়ে লাল সূর্যের নিচে

গলুই ছাপিয়ে শুধু ফুঁসে ওঠে জল আমি মুখ তুলে দেখি
প্রথম সিগাল ডানা মেলে ওই উত্তরে ক্ষীণ তটরেখা...

এসেছি ভারত থেকে নুনের পোষাক গায়ে এই মহাদেশে
কাঠবাদামের ত্বক তোমার, তোমার খোলো ভোরের বাকল

রেখেছ শঙ্খগুলো জড়ো করে ? আমার সম্বল বলতে শুধু
টিনে ভরা সয়াবিন, কিছুটা পানীয় আর ফার্স্ট এড বক্স

কুয়াশা গিয়েছে কেটে, বুড়ির চুলের মত ঝুঁকে আছে রোদ
নৌকো ভাসাই চলো খাঁড়িপথ বেয়ে উপসাগরের দিকে....

তোমার গলার স্বর উড়ুক্কু মাছের মত ফিসফিস করে
স্বপ্নের মধ্যে, আর আমি জেগে উঠে খুলে ধরি ম্যাপবই

কতদূরে আফ্রিকা ? আরো কতদূরে তুমি স্তব্ধ উপকূলে ?
মাঝখানে জলরাশি, শেষরাতে রুপোলি ফানুশ উড়ে যায়

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

**P. S. UDYOG**

MECHANICAL ENGINEERS

*City Office :*

10, Middleton Row,
3rd FLOOR REAR BLOCK
Calcutta–700 016
Post Box 9009
PHONE : 29-4846/4874/4896

*Works :*

68/D, BANGUR AVENUE,
CALCUTTA–700 055
PHONE : 59-5352



## তৃণমূল থেকে কবিতা

সুবোধ সরকার

যে কবিতা লিখতে পারি না অথচ যে কবিতা লিখতে চাই—এ বিষয়ে প্রত্যেকের একটা স্বপ্ন থাকে। কেউ কেউ থাকেন যাঁরা সেই স্বপ্নের যোগ্য হয়ে ওঠেন, যোগ্য করে তোলেন নিজেকে। কারো কাছে হয়ত সেই স্বপ্ন স্পর্শাতীত থেকে যায়, এক মানবজীবন তাঁর কাছে অকিঞ্চিতকর মনে হয়, তখন তাঁর মনে হবেই আর একবার সুযোগ পেলে সে দেখবে।

আমার বয়স পঁয়ত্রিশ। অন্তত পাঁচ হাজার কবিতা আমি পড়েছি। কবিতা সম্পর্কে অন্তত ১০০/২০০ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পাঠ করেছি, নিজে অন্তত ৩০০ কবিতা লিখেছি। গত দশ-বারো বছরে কবিতা নিয়ে যত চিন্তা করেছি, বা বলা যায় যত দুশ্চিন্তা করেছি, অন্য কোন বিষয়েই এতো মনোযোগী হইনি, তো আজ মনে হয় আমাকেই যদি দেওয়া হত আর একটি সুযোগ, অর্থাৎ আমি আমার সমস্ত লেখা মুছে ফেলে, ছাপানো পাতাগুলো পুড়িয়ে ফেলে যদি ভস্ম ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে পারতাম, তাহলে কোন কবিতা আমি বেছে নিতাম, কোন ভাষা হয়ে উঠতো আমার ভাষা, কোন জীবন হয়ে উঠতে পারতো আমার জীবন।

### কোন ভাষা, কোন জীবন ?

আতুকেই ওকাই নামে আফ্রিকার এক কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল দিল্লিতে। ঘানার এই কবি পশ্চিমের সভ্যতাকে হাড়ে হাড়ে চেনেন, তিনি ভারতে এসেছিলেন শুধু তাজমহল দেখতে নয়, পরিষ্কারভাবে এই কথাই জানাতে যে আফ্রিকার সঙ্গে আমাদের অনেক মিল। রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন, ইকবাল পড়েছেন, লিখেছেন এঁদের নিয়ে প্রবন্ধ। তাঁর মনে হয়েছে ভারতবর্ষ তাঁর ভায়ের মতো, যে ভায়ের গায়ের রঙ তাঁর রঙের থেকে কম কালো। অসম্ভব রাগী বলিষ্ঠ ভাষায় তিনি একটি প্রেমের কবিতা পড়ে শোনালেন, এক শ্বেতাঙ্গিনী তাঁকে কথা দিয়েছেন, অথচ তিনি কিছুতেই দেখা করছেন না। অভিমান, অভিমান, আর অভিমানে ভাঁত কবিতাটি, কিন্তু মনে হল এ যেন সমগ্র আফ্রিকা একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ড্রাম বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আমরা কথা দিয়েছিলাম আমরা তোমাকে ভালোবাসবো, কিন্তু ভালোবাসতে পারিনি। মন্ত্রমুগ্ধ বসে থাকার পর হঠাৎ একজন ওকাইকে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তুমি কেন ইংরেজিতে কবিতা লেখ, তোমার নিজের ভাষা কোথায় ? ওকাই মাথাটা বাঁকিয়ে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে বলল, এটা ইংরেজি নয়, এটা আফ্রিকান, লন্ডনে থাকার সময় আমি আবিষ্কার করি

ইংরেজি আমার ভাষা হলেও লন্ডনের ইংরেজি আমার ভাষা নয়, নিউইয়র্কের ভাষা আমার ভাষা নয়, আমার ভাষা ঘানার ভাষা, আফ্রিকার ভাষা, খেতে না-পাওয়া মানুষের ভাষা।

ওকাই যা বলতে চেয়েছিলেন তার সারকথা হল এই যে, এটা সত্যিই তিনি ইংরেজিতেই লেখেন তাঁর কবিতা, কিন্তু সে এমন এক জাতের, এমন এক গোত্রের, শতশত বিচিত্র ধ্বনিমিশ্রিত সেই ভাষা একসময় হয়ে ওঠে এতোটাই আফ্রিকান যে তার আবরণেই থাকে শুধু রোমান হরফ, হরফের ফাঁক দিয়ে হরফ ঠেলে বেরিয়ে আসে কালো, দরিদ্র, অত্যাচারিত এক মানবগোষ্ঠীর মুখ। এ সেই ক্রীতদাস বালকের গল্পের মতো, যে তার মালিকের হাত থেকে পালিয়ে এসেছিল, পালিয়ে আসার সময় সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল রুপোর কাজ করা একটা জলের গ্লাস, কিন্তু সেই সুন্দর গ্লাসে সে জল খেতে পারতো না। একদিন সেটা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে দুমড়ে মুচড়ে একটা থ্যাবড়া ধরনের 'কুৎসিত' পাত্র তৈরী করলো, তারপর থেকে সে মনের আনন্দে জল খেত সেই পাত্রে। ওকাই-এর ইংরেজিও সেই পাত্রের মতো নিজস্ব, সেই পাত্রের মতো অহংকারী, শুধু রুপোটা থেকে গেছে এই মাত্র।

ওকাই-এর কথা থেকে যে সত্য উঠে আসে তা হল ভাষা হবে এমন মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে কোন এক জনগোষ্ঠীর ভালোবাসার কথা, দুঃখের আনন্দের কথা উঠে আসে। তাহলে কবিতার ভাষার এই দায় থেকেই যায় যে সে একজনের ভাষা নয়, সে এক মানবগোষ্ঠীর ভাষা। সে যতই নির্জনতম অন্তরের উৎসারিত প্রকাশভঙ্গি হোক, কোথায় যেন তার একটা দায়িত্ব আছে যে তাঁকে পৌঁছতে হবে অনেকের কাছে। ওকাই প্যান আফ্রিকান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল। বোঝাই যাচ্ছে তিনি একজন এলিট। কিন্তু একজন এলিটের ভাষা কখনোই হতে পারে না কোন জনগোষ্ঠীর ভাষা এবং তা আফ্রিকা বা ভারতে আরো অসম্ভব। ওকাই এলিট হয়েও পেরেছেন তৃণমূলে পৌঁছতে।

## তুকারাম বনাম এলিট

বাংলা ভাষার একটা ইতিহাস আছে, আছে ঐতিহ্য, পূর্বাপর ওঠা নামা আছে, আছে এক নদীমাতৃক অহংকার। উটের গ্রীবার মতো সে যেমন বিষণ্ণ হতে পারে, তেমনি অন্তর্জলী যাত্রার গঙ্গার মতো অসংখ্য সেমিকোলন পীড়িত এক রহস্যময় গগনস্পর্শী উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে তার। কিন্তু আজ হয়ত সময় এসেছে একথা বলার যে বাংলা ভাষা মূলত শিক্ষিতের ভাষা। এই ভাষায় যারা লিখেছেন তাদের বেশীরভাগ লেখকই এলিট এবং উচ্চবর্ণের। আমাদের এখানে ভারতবর্ষে যেহেতু একটু আগে শিক্ষা শুরু হয়েছিল,



এবং ঘটনাচক্রে উচ্চবর্ণের মানুষই শিক্ষা পেয়েছেন আগে, স্বাভাবিক কারণেই আজ পর্যন্ত কোন নিম্নবর্ণের লেখক উঠে আসেননি আমাদের ভাষায়। কেননা এখানে জাতপাত নিয়ে সমস্যাটা বিহার বা মধ্যপ্রদেশের মতো নয়, মহারাষ্ট্রের মতো নয়। আমাদের এখানে দলিত আন্দোলন হয়নি, বদলে নকশাল আন্দোলন হয়েছে, নকশাল আন্দোলন কখনো বলেনি, ও ব্যাটা ব্রাহ্মণ ওকে মার। এদিক থেকে সামাজিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে কিছুটা অহংকার আমাদের হয়ত মানিয়ে যায়। কিন্তু অহংকার মানিয়ে গেলেও, অন্যদিক থেকে একটা ক্ষতি আমাদের হয়ে গেছে। 'দলিত' অর্থাৎ সমাজে যাদের জাতের কারণে পদদলিত হয়ে থাকতে হয়েছে, তারা আজ, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে, অন্ধ্রতে, কর্ণাটকে একেবারে ওপরস্তরে উঠে এসেছে। ফলে একজন নামদেও ধাসাল বা একজন সিদ্ধলিঙ্গাইয়ার হাতে এসে কবিতার ভাষা নতুন বাঁক নিয়েছে মারাঠিতে, কন্নড়ে। দলিত হিসেবে একজন সিদ্ধলিঙ্গাইয়ার যে ভাষা সে ভাষা একজন এলিটের থেকে আলাদা হতে বাধ্য, এবং তাঁর এই আলাদা হয়ে যাওয়াটা এতোটাই ভাষার ভেতরকার কথা যে স্বাভাবিকভাবেই তা কন্নড় ভাষার পক্ষে এক নতুন মাত্রা যোগ করতে সমর্থ হয়েছে।

আসল কথা হল এই যে এমন এক শ্রেণীর মানুষ উঠে এলেন যার ফলে ভাষা হয়ে উঠল আরো ধনী, আরো সুগম্য, আরো মুক্ত। বাংলা ভাষায় সেই অর্থে কোন বর্ণবিভাজন না থাকায়, ব্রাহ্মণ শূদ্র চণ্ডাল বলে কোন ভাষাবিদ্বেষ না থাকায় আমরা সুখী হয়েছি বেশী। কিন্তু কবিতার ভাষার দিকে তাকালে আজ একটা দুশ্চিন্তা চলকে উঠে। আমরা যে ভাষায় কবিতা লিখি সেটা কার ভাষা? কতজন মানুষ সেই ভাষার কাছাকাছি থাকেন? কবিরা ভাষা নিয়ে, ভাষার বিশুদ্ধতা নিয়ে এতো বেশী মগ্ন থাকেন যে তাঁরা খেয়ালই করেন না শুধুমাত্র ভাষাব্যবহারের বিশিষ্টতার জন্য তাঁরা এতটা দূরে সরে যান পাশের বাড়ির লোকজন থেকে। একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ দিই। যে কবিকে নিয়ে এই গল্প তিনি আমার কাছে প্রাতঃস্মরণীয়। আমি তাঁর কবিতা থেকে অনেক কিছু শেখার চেষ্টা করি, পারি না। তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'জ্ঞানপীঠ' পাবার পর তাঁকে শহরের বিভিন্ন জায়গায় সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছিল, লেক পল্লীর অনুষ্ঠানে আমি দর্শকাসনের একটা কোণায় বসে চুপচাপ দেখছিলাম। ওপরে খোলা আকাশ, মুক্ত মঞ্চ, চারপাশে বাড়ির ছাদে শিক্ষিত নরনারীর আগ্রহী উঁকিঝুঁকি। মঞ্চে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে উপস্থিত আরো সব বিখ্যাত ব্যক্তিরা। আর সবার মাথার ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'মাটির কাছে ফিরতে হবে বাংলা কবিতাকে'। আমার পাশে বসে থাকা একটি ঝকমকে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার ছেলে আর একটি ছেলেকে জোরে জোরে

লাইনটা পড়ে শোনালো, তারপর দুজনে দুজনের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন কোন হাস্যকর বস্তু লেখা আছে ওই পঙ্‌ক্তিটিতে। আর আমার একপাশে বসেছিল একেবারে এক তরুণ কবি, সে বললো : এই কথাটার কোন মানে নেই, বাংলা কবিতা কোনকালে কি আকাশে ছিল যে তাকে মাটিতে নামতে হবে ?

আসলে বাংলা ভাষা বহু পথ অতিক্রম করে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তা যতই বিচিত্রমুখী হোক, যতই বহুপথগামী হোক তার ধারা কোথায় যেন এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। সমৃদ্ধ হতে হতে, সুন্দর হতে হতে কবিতার ভাষা হয়ে উঠেছে এতোটাই অভিজাত, এতোটাই এলিট, এতোটাই নীলরক্তলোভী যে তাকে রাস্তায় নেমে এসে দাঁড়াতে হবেই। রাস্তায় নেমে এসে দাঁড়ানোর কথা অনেকেই বলেন কানে কানে, কেউ কেউ হয়ত নেমেও পড়েন। কিন্তু সেটা উইকএন্ডে ধলভূমগড় গিয়ে সভ্য লোকেদের মহুয়া খাওয়ার মতো। কবিতার ভাষা এখন এতোটাই সভ্য এতোটাই ভদ্রতার ভাষা যে তাকে খিস্তিও করা যায় না। সত্যিই তো একটা ধুতিপাঞ্জাবি পরা এক হাতে ছাতা অন্য হাতে গ্রন্থসম্ভার নিয়ে যে মাষ্টারমশাই বাড়ির দিকে চলেছেন তাকে কি গালাগাল দেওয়া যায়, তার দিকে কি পচা ডিম ছোঁড়া যায় ?

মারাঠি কবি তুকারামের কথা শোনা যাক। তুকারাম ছিলেন শূদ্র। আর একজন শূদ্রের কবিতা লেখা ছিল সেইযুগে একধরনের অপরাধ। এই কবিকে ব্রাহ্মণদের হাতে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। ১৬০৮-এ জন্মে মাত্র একচল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। ১৬২৯-এর ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে তিনি তার প্রথমা পত্নীকে মরতে দেখেছেন। তিনি ৫০০০ মতো কবিতা লিখেছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণরা তাঁকে তাঁর পান্ডুলিপি ডুবিয়ে দিতে বাধ্য করে। তিনি নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত কবিতা, কিন্তু ১৫ দিন বাদে তাঁর সমস্ত কবিতা নদীগর্ভ থেকে উঠে আসে। এই গল্পটুকু বাদ দিলে যা অবশ্যই তাঁর ভক্তদের তৈরী করা, তাঁর জীবন যতটা দুঃখের ততটাই বীরত্বের। অর্থাৎ তিনি তাঁর নিজের ভাষায় একেবারে নিজস্ব ভাষায় লিখে গিয়েছেন তাঁর নিজের কবিতা। তিনি কোন ব্রাহ্মণের কাছে বেদ পাঠ গ্রহণ করেননি, কোন ব্রাহ্মণকে দিয়ে কোন অভিজাতকে দিয়ে কোন নীলরক্তের আচার্যকে দিয়ে তিনি নিজের সমর্থনে কোন কীর্তনআসরে বক্তৃতা করিয়ে নেননি। স্বাভাবিক কারণেই যে মারাঠি ভাষা সেই সময়ে অভিজাতদের হাতে ছিল, তুকারামের সহজ মরমী স্পর্শে তা হয়ে উঠল একেবারে সাধারণ মানুষের ভাষা। এ শুধু দোহা নয়, তুকারাম এমন কিছু কবিতা লিখেছেন যা সেই সময়কে স্পর্শ করে আছড়ে পড়েছে আমাদের অসময়েও। তিনি সাধারণ 'নীচু জাতের ভাষা' ব্যবহার করেও আজ এতোটাই গ্রহণযোগ্য মারাঠিতে যে দিলীপ চিত্রের মতো আধুনিক কবিকেও



জীবনের ৩০ বছর উৎসর্গ করতে হয়েছে তুকারামের অনুবাদে। সাড়ে তিনশো বছর আগে যে ভাষা, যে 'ল্যাঙ্গোয়েজ ফ্রম বিলো' তিনি ব্যবহার করেছেন তাতে একথা জোর দিয়ে বলা যায় তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম উত্তর-আধুনিক কবি যিনি মানুষের অন্তরে পৌঁছেছেন সঠিক পথে। চাষাভুষা মানুষের ভাষাই হয়ে উঠেছিল তাঁর কবিতার ভাষা, তার জন্য কোন পালিশ দরকার ছিল না। তথ্য হল এই ৫০ মিলিয়ন লোক যে মারাঠি ভাষা আজ ব্যবহার করে তা তুকারামের মুখের ভাষা, তা সেই সাড়ে তিনশ বছর আগেকার সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ রাজন্যবর্গের ভাষা নয়।

তুকা বললেন :

১. মরীচিকাটি হয়ত ছিল গভীর
কিন্তু সে তো মরীচিকাই ছিল

কখনো নয় ভুল
কখনো তাতে তৃষ্ণা মিটবে না।

২. ধরা যাক, আমার এই শরীর
একটি পাত্র
তোমার বিষ্ঠা ধারণ করতে
লাগুক কাজে পাত্র।

৩. আমি পারিনি
খাদ্য ভাগ করতে
পারিনি আমি
জঙ্গলে চলে যেতে।

সুতরাং ওগো নারায়ণ
আমি চাই
তোমার কাছে সান্ত্বনা চাই আমি।

আমার কোন অধিকার নেই
কবিতা লেখার
কবিতা পড়ার

কিছুটা জীবন আমি জেনেছি
কিন্তু বাকীটা এখনো এক ধাঁধা।

আমার অক্ষম অনুবাদেও একথা বোঝা যায় যে সেই সময়েও তুকারাম ছিলেন কতটা আধুনিক, সলোমন রুসদির দুঃখকেও তিনি স্পর্শ করতে পারেন সাড়ে তিনশ বছরের দূরত্বে থেকেও। সেইসময়েও তুকারামের ভাষা কিভাবে একইসঙ্গে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের ভাষা হয়ে উঠছিল তার একটা নমুনা বহিনাবাই শিউরকর। ১৬২৯-এ জন্মে এই মহিলা হয়ে ওঠেন মারাঠি ভাষার একজন উল্লেখযোগ্য কবি। কিন্তু তিনি বিয়ে করেছিলেন এক গোঁড়া ব্রাহ্মণকে। তিনি তুকারামের এতো ভক্ত হয়ে ওঠেন যে স্বপ্নে দেখেন তিনি সুদূর গ্রামে পায়ে হেঁটে তুকারামের কাছে পৌঁছেছেন এবং তুকারামের আশীর্বাদ নিচ্ছেন মাথা পেতে। মাঝরাতে এই স্বপ্ন তিনি তাঁর স্বামীকে বলেন, স্বামী এতোটাই রেগে যান যে তিনি কিল-চড়-ঘুঁষি মেরে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। তবে ইতিহাস বলে এই ক্রোধোন্মত্ত স্বামী পরে তুকারামের ভক্ত হয়ে ওঠেন, মুগ্ধ হয়েছিলেন তুকারামের কবিতা শুনে। এই উপকথা থেকে এই ধারণা হওয়া অমূলক নয় যে এখান থেকেই শুরু হয়েছিল তুকারামের দিগ্বিজয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণরাও তাঁর আত্মীয় হয়ে উঠতে চাইছিলেন, যদিও কারো কারো বিশ্বাস ব্রাহ্মণরাই তাকে মেরে নদীর জলে তাঁর পান্ডুলিপি সমেত ফেলে দিয়েছিল। একটা কবিতায় আছে তুকারাম তার বন্ধুদের বলছেন 'বিদায়, আমি চললাম, তোমরা থাকলে, আমি আমার বাড়ির পথে চললাম।'

তুকারামের ভাষা, তুকারামের কবিতা যদি একটা ভাষাকে আমূল পাল্টে দিতে পারে, এক নতুন স্পন্দন যদি তুলে আনতে পারে ভাষার নতুন আত্মায়, তার থেকে বড় কথা আর কি থাকতে পারে। আমার মনে হয় বাংলা কবিতার ভাষা মূলত শিক্ষিত মানুষের ভাষা, তাকে একটু নীচে নেমে আসতে হবে, তাকে এলিট ঐশ্বর্য থেকে মাটি-পৃথিবীর কাছে নেমে নতজানু হয়ে একবার বসতে হবে। কিন্তু আমি জানি আগামী ২৫/৩০ বছরে তা হবার নয়। বাংলা ভাষা এই মুহূর্তে অন্য কোন ভাষার সাহচর্যে বেড়ে ওঠার কথা ভাবতে পারে না। এককালে সে ইংরেজি থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছে, পাশ্চাত্যের যতই গুণ থাক তাদের সব গুণ তো আর নিজেদের শরীরে ধারণ করা যায় না, যথেষ্ট করেছি, এখন গুণের ভারে কিছুটা শ্লথ হয়ে এসেছে বাংলা ভাষার শরীর। যেহেতু বাংলা ভাষা অন্য কোন সহোদরা ভাষার সঙ্গে ভাই-ভাই সম্পর্কে বিশ্বাসী নয়, সেহেতু তাকে আচিরেই আরো অভিজাত হয়ে উঠতে হবে। এর পেছনে আর্থ সামাজিক কারণই সবচেয়ে বেশী, যে ভাই একদিন বেশী শিক্ষিত ছিল সে ভাই অবজ্ঞার চোখেই দেখে গেল অন্যদের। কিন্তু একজন কবির জানা উচিত যে, তিনি যে ভাষায় কবিতা লিখছেন সেটা তার নিজের ভাষা। ইংরেজিতে শেক্সপীয়র জন্মেছেন বলে একজন তরুণ ব্রিটিশ কবি ক্রেগ রেনের কি সুবিধে আমি জানি না। বাংলায় জীবনানন্দ লিখে গেছেন বলে আমার তাতে কি হলো, আমাকে তো আমার জন্য তৈরী করে নিতে হবে আমারই



প্রয়োজনীয় ভাষা। সুতরাং আজ যখন মণিপুরী ভাষায় ইবোমচা সিং-এর কবিতা শুনি তখন একবারো মনে থাকে না যে তিনি একটা অনুন্নত ভাষায় কবিতা লিখছেন, তার ভাষায় কোন বড় কবি যেহেতু নেই সেইহেতু তিনি ছোট কবি, এই বালখিল্য যুক্তি একধরনের ভাষা-ঔদ্ধত্য যা সহ্য করা যায় না। হতেই পারে যে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তরুণ কবিটি ডোগরি ভাষায় লিখে চলেছেন। গত কুড়ি বছরে বাঙালি সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে তা বাংলার বাইরে পা রাখলেই টের পাওয়া যায়; বাঙালির হাত থেকে যে কবিতার ভাষাটাও চলে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। আগে সে অনেক দিয়েছে, এবার তাকে নিতে হবে। উচ্চবিত্ত বাঙালি যেহেতু বাংলা ভাষা নিয়ে মাথা ঘামায় না এবং তাদের ব্যানার্জী-চ্যাটার্জী ছাড়া আর কোন বাঙালী চিহ্ন যেহেতু নেই সুতরাং তাদের আঁকড় বলাই ভালো, তারা যেন অন্য গ্রহের জীব, ভুল করে ভারতভূখন্ডে এসে পড়েছিল, কথা ছিল আটলান্টিকের ওপারে গিয়ে পড়ার। সুতরাং হাতে থাকে অগণিত 'অশিক্ষিত', 'অশোভন', 'অমার্জিত', অবহেলিত এক মানবসমাজ যারা ছড়িয়ে রয়েছে গাঙ্গেয় উপত্যকায়, তাদের ভাষা নীলরক্তলোভী নয়, তাদের উচ্চারণ কোন কৃত্রিম মুদ্রায় বিভ্রান্ত নয়, তাদের ভাষা সোজাসুজি একেবারে মর্ম থেকে উৎসারিত যেটা তারা কোন বিদ্যালয় থেকে পয়সা দিয়ে শিখে আসেনি। সেই সম্মিলিত মানবগোষ্ঠীর ভাষাই হতে পারে এখনকার কবিতার ভাষা, সেই ভাষাই হয়ে উঠতে পারে সবচেয়ে আধুনিক ভাষা। ১৯০০-এ যখন নিউইয়র্কের হার্লেমে কালো লেখক, কালো কবি, কালো গায়ক, কালো শিল্পী এঁরা এসে জড়ো হলেন প্রথমে সবাই ভুরু বাঁকিয়েছিল, কিন্তু দশ বছরের মধ্যেই কবি ল্যাঙ্গস্টন হিউজ বুঝিয়ে দিলেন কালো মানুষের ভাষা কত সাংঘাতিক হতে পারে। প্যারিস থেকে লন্ডন থেকে লিখিত সমাজ এসে উঠলো হার্লেমে, হার্লেম হয়ে উঠলো এমনকি শ্বেতাঙ্গদেরও বিবেক, সেখান থেকেই জন্ম নিল হার্লেম রেনেসাঁ।

## একটি স্বপ্ন

নিরালা সাধারণ মানুষের ভাষায় লিখেছেন, তুকারাম দরিদ্র মারাঠির ভাষা চিনে ছিলেন, ওকাই চাইছেন আফ্রিকার ভাষা, হিউজ চেয়েছিলেন কৃষ্ণাঙ্গের ভাষা আমেরিকা জয় করুক। এই মুহূর্তে তরতাজা তরুণ ছেলেমেয়েরা যে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে কবিতা লিখে চলেছেন তাদের চেষ্টায় যত্ন আর শ্রদ্ধা আছে। যাঁরা কাজ করেন, লেখেন, ছবি আঁকেন তাঁদের ভালো না বেসে পারা যায় না। যে যার ক্ষমতা অনুসারে কাজ করেন। ক্ষমতা, অক্ষমতা নিয়ে তর্কাতর্কি না করে, খুব ঠান্ডা মাথায় এটা ভাববার সময় এসেছে যে বাংলা কবিতার ভাষাকে শিক্ষিতের গ্রাস থেকে বের করে আনা দরকার। তার

একটু 'অমার্জিত' হবার সময় এসেছে। একমাত্র শিল্প মাধ্যম কবিতা যার কোন উপযোগিতা নেই, কবিতা ঘরে টাঙানোও যায় না, কিছু লোক আছে যারা কবিতা আবৃত্তি করে, আর কিছু লোক আছে যারা হলে টিকিট কেটে শুনতে যায়। শোনা যায় আবৃত্তির স্কুলও নাকি দু'একটা হচ্ছে। সুতরাং যে শিল্পের কোন সামাজিক প্রয়োজন নেই সেই শিল্প কখনো দাঁড়াতে পারে না। বাঁচতে পারে না। কবিতার ভাষা মরে যাচ্ছে কথাটা ঠিক নয়, বলা যায় ভাষা এমন এক শোভন শিক্ষিত মার্জিত স্তরে এসে থেমে আছে যাকে বদ্ধ জলাশয় বলা যায়, আর জলাশয় বদ্ধ হয়ে গেলে তা যতই সুন্দর হোক মশা-মাছির উৎপাত বাড়বেই। কোন জায়গায় এসে আটকে থাকার নাম মৃত্যু, সেই মৃত্যুর জন্য বাংলা কবিতার ভাষা অপেক্ষা করে আছে।

## ভাষার জীবন, জীবনের ভাষা

ভাষার মৃত্যু হয় না, ভাষা কখনো মারা যায় না। আবার এও ঠিক, ভাষা চিরস্থায়ী নয়, তবু প্রবাদ আছে ভাষা প্রতি তিন মাইলে বাঁক পাল্টায়। তিন মাইলেই হোক আর দশ মাইলেই হোক এই যে ভাষা পাল্টে পাল্টে যায় এটাই হল ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি। ভাষার অন্তরে এমন এক মুক্ত মন আছে যা প্রত্যেকেই গ্রহণ করার চেষ্টা করে, সে যেমন রাজদরবারেও পরিবর্তনশীল, তেমনি মাঝিমাল্লাদের সঙ্গেও তার গতি প্রবহমান। তবে যে কোন ভাষার ইতিহাসের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে ভাষা নীচের থেকে যত দ্রুত পাল্টায় ওপর থেকে তত পাল্টায় না। ভাষা মাছের বাজারে, বেশ্যালয়ে, গলির মোড়ে, চায়ের দোকানে, অন্ধকার জগতে যত জ্যান্ত, যত সৃজনশীল ততটা নিশ্চয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে নয়। ভাষার শরীরে যে রক্ত সেই রক্তের নাম গণতন্ত্র, সে যেমন তুকারামকে গ্রহণ করতে পারে তেমনি সে ভারতচন্দ্রকেও স্বীকরণ করতে সক্ষম। ভাষা চায় এক আসনে এসে বসুক তুলসীদাস এবং শূদ্রক, নিরালা এবং রবীন্দ্রনাথ, মুক্তিবোধ এবং সতীনাথ ভাদুড়ী। এই সব নিয়ে, শূদ্র ব্রাহ্মণ নিয়ে, অভিজাত এবং ভবঘুরেদের নিয়ে, গণিকালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এই যে বিপুল তরঙ্গ সেই তরঙ্গই হলো ভাষার জীবন, সেই তরঙ্গই হলো জীবনের ভাষা।

আধুনিক বাংলা কবিতার দিকে তাকালে সহজেই অনুমান করা যায় যে কবিরা মূলত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষ, সমাজে মোটামুটি সম্মানজনক ব্যক্তি। মুদ্রণযন্ত্রের ব্যাপক প্রসার যে শিক্ষিতকে আরো শিক্ষিত করার জন্য তা আমরা জানি। এটা বেশ মজার, এই মুহূর্তে বাংলা কবিদের বায়োডাটা দেখলে জানা যাবে যে তারা হয় পড়ান না হয় সংবাদপত্রে চাকরি করেন। একজনও নাবিক নেই, একজনও বিজ্ঞানী নেই, একজনও



হরিজন নেই, একজনও বোহেমিয়ান নেই, একজনও রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতো পর্যটক নেই। তো বাংলাভাষা এখন সম্পূর্ণভাবে সংবাদপত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ দুদিকে দুই খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। সাংবাদিকদের ভাষা অনেকটা জ্যোতিষীদের ভাষার মতো, সহজে পাল্টায় না, আমার বাবার যিনি কুষ্ঠি তৈরী করেছিলেন তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন আজ যদি আমি আমার ছেলের কুষ্ঠি করাই দেখবো সেই একই ভাষা চলে আসছে। সাংবাদিকদের দোষ নেই, তাদের কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করে চলতে হয়, তাদের হাত পা টেবিলের সঙ্গে বাঁধা। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকজন? তারা তো ভাষাকে খুব একটা ভালোবাসেন না, জীবন্ত শরীর তাঁদের পছন্দ নয়, তাঁরা মৃতদেহের উপাসক। ভাষা তাঁদের মাধ্যম কিন্তু যে ভাষা চলমান, যে ভাষা সম্ভাবনার বাঁকে দাঁড়িয়ে তার সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ নেই। দুএকজন বাদ দিলে বেশীর ভাগ অধ্যাপক হলেন এক একটি রাতজাগা ভাষা-মার্গের প্রহরী। এখানে নয়, ইউরোপেও তেমন করে নয়, তবে বেশ কয়েকটি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিয়েটিভ রাইটিং কোর্স চালু হয়েছে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানসিকতা পালটাতে সক্ষম। একজন তরুণ লেখক কি ভাবছেন তার স্পর্শ পাবার জন্যই এইসব কোর্স, আফ্রিকার কোথায় কে কি লিখছে বা জাকার্তায় এই মুহূর্তে ভাষা কোনদিকে বাঁক নিয়েছে সে সব তথ্য আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক লেখক শিবিরে বসেই পাওয়া যায়। যেহেতু এখানে সে সুযোগ তৈরী করার কারোর কোন উদ্যোগ নেই [ সম্প্রতি কর্ণাটকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন ভাষার কবি-লেখক-অনুবাদক মিলিত হয়ে কাজ করতে পারবেন, অনুবাদ করতে পারবেন, বেশ মজার এরা কোন বি, এ / এম, এ ডিগ্রি দিচ্ছেন না, পি. এইচ-ডি এদের ন্যূনতম ডিগ্রি। সুখবর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন একজন কবি, তার নাম চন্দ্রশেখর কাম্বার ], যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা দায়িত্ব থাকে সেমিনারের দিকে এবং পান্ডিত্যের পেশী দেখানোই হল প্রধান লক্ষ্য, সেখানে সৃজনশীল কবি লেখকের প্রবেশ প্রায় জতুগৃহে প্রবেশের মতো। কিন্তু তারাও ভালো করেই জানেন ভাষা তার পাপড়ি উন্মোচিত করে একজন প্রকৃত কবি লেখকের হাতে এবং সেই পাপড়ির বর্ণ এবং তার অন্তর্নিহিত যৌন আবেদন কোন ক্লাসরুমে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

## দ্বিতীয় ভাষার সন্ধানে

বাংলা কবিতা এই মুহূর্তে যে ভাষার সমর্থক, যে কারুকৃতির উপাসক তা হল সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাষা। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী—এটা এমন একটা শ্রেণী যাদের হো-চি-মিনকেও ভালো লাগে আবার 'ডেবোনেয়ার' পড়তেও ভালো লাগে, কিন্তু একা কোন শিক্ষিত পাঠরতা মেয়েকে বাড়ি ভাড়া দেয় না। সুতরাং যে

জীবনভঙ্গির মধ্যেই রয়ে গেছে একধরনের ভুল শ্রেণীবোধ, ভুল সৌজন্যজ্ঞান, তো তাদের ভাষা কৃত্রিম হতে বাধ্য। কান খুলে রাস্তা দিয়ে হাঁটলেই টের পাওয়া যায় মধ্যবিত্তের সংযত উচ্চারণ, কৃত্রিম ভঙ্গি, অনুত্তেজিত কণ্ঠ-মুদ্রা। কিন্তু পাড়ার মোড়ে যে ছেলেটা রোল বিক্রি করছে শুনুন তার ভাষা, যার কাছ থেকে আপনি তরকারি কিনলেন দেখুন তার আচরণ, একজন মজুর কিভাবে কথা বলে শুনুন, শুনুন একজন মোটর মেকানিক কিভাবে কথা বলে। বাসের দরজায় একজন ঝুলছিল সে কিছুতেই ভেতরে ঢুকবে না, না পেরে ভেতর থেকে কন্ডাকটর ড্রাইভারকে বললো, 'দে তো পাশের ২২১-এর সঙ্গে ওর ওটা ঘষে দে'। ম্যাজিকের মতো কাজ হলো, লোকটি ভেতরে ঢুকে এল। 'ওর ওটা ঘসে দে'—এতো যে অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল বাংলা ভাষাতেই তা কি খুব জানা ছিল আমাদের? নিশ্চয় কোন মধ্যবিত্তের কাছ থেকে আমরা এরকম কোন 'অশোভন' বাক্য পেতাম না। আসলে ভাষা কখনোই অশোভন হয় না, সে শুধু মাধ্যম, একেবারে নিরাসক্ত এক পরিবাহী যার ভেতর দিয়ে আমাদের রাগ, ভয়, অভিমান, ক্ষোভ সব যাতায়াত করে। যে ভাষা দরিদ্রের, যে ভাষা সর্বহারাদের, যে ভাষা শ্রমিকের, যে ভাষা রাস্তার ভাষা, কোথায় সেই ভাষা? এমন কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ভাষায় বিজ্ঞাপন দেয় অবহেলিতের জন্য, তাও তো শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভাষা। খুব শীঘ্র সেই ভাষা পাল্টানো দরকার। যারা পানীয় জল অপচয় করে, রাস্তায় কল খুলে রাখে, সে রাস্তার মানুষেরা জীবনেও আকাশের দিকে মুখ তুলে বিজ্ঞাপনটি পড়ে দেখে না, সেটা আমার বা আপনার পড়ে কি লাভ? আমরা বড়জোর বলবো বাক্যটায় ওইখানে একটা সেমি-কোলন হলে ভালো হতো।

কবি, যিনি প্রকৃতই কবিতা লিখতে এসেছেন, তিনি সেই কুঠার ইতিমধ্যেই কাঁধে তুলে নিয়েছেন যে তাঁকে কবিতা ছাড়াও ভাষার এমন এক স্তরে পৌঁছতে হবে যেখানে আগে কেউ যায়নি। তিনি যেখানে পৌঁছতে চাইছেন সেখানে যে তিনি পৌঁছতে পারবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই, ভাষা এবং কবিতা এরা ততোটাই রহস্যময় যে কখন তারা ধরা দেবে, কখন তারা তৃষ্ণার্তকে পানীয় দেবে তার কোন পূর্বাপর ইতিহাস নেই। কিন্তু কবির কাজ সম্মানের কাজ। তিনি যে ভাষায় জন্মেছেন, যে ভাষায় বড় হয়েছেন, সেই ভাষায় লিখতে লিখতে তিনি সেই ভাষারই এক দ্বিতীয় ভুবন তৈরী করেন, যেটা তার নিজস্ব, নিজের অন্তর্বাসের মতো নিজস্ব, আর সেটা সবাই বুঝতে পারেননা বলেই একটা কুণ্ঠাও তৈরী হয় সঙ্গে সঙ্গে। এই যে দ্বিতীয় ভুবন দ্বিতীয় ভাষা, এটা যেমন প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ কবির আকাঙ্ক্ষা, তেমনি যে কোন জীবন্ত ভাষারই দাবি যে তাকে কেউ এসে দুমড়ে মুচড়ে পাল্টে নিক, নিজের করে নিক। এই 'দ্বিতীয় ভাষা' ছাড়া এই মুহূর্তে বাংলা কবিতা, তা যতই সূক্ষ্মতায় স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠুক, নিজের পায়ে উঠে



দাঁড়াতে পারবে না। আমি জ্যোতিষী নই, আমি বলতে পারি না, সেই দ্বিতীয় ভাষা কোথা থেকে উঠে আসবে, কোন্ নক্ষত্রবিজয়ীর হাতে নেমে আসবে। তবে এটা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটা সীমাবদ্ধতা আছে, তবু সে বেঁচে আছে, সেটাই অনেক।

কিন্তু আমার স্বপ্ন বাংলা কবিতার ভাষা একদিন দরিদ্রের ভাষার কাছে নেমে আসবে, একদিন অবহেলিতের মুখে সে ব্যঞ্জনা তৈরী করবে, একদিন সে বলতে পারবে রাস্তার ভাষা। কিন্তু সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আমরা শিক্ষিত নাগরিক, আমরা কোনদিন বাংলা ভাষার সেই অতলে নামতে পারবো না। আমি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি, পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি দেখতে পাচ্ছি নতুন দিনের ছেলেমেয়েদের, যারা তাদের কবিতাকে যুক্ত করে দিচ্ছেন এক মানবগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে, যে ভাষার কাছে বাংলা ভাষা আগে কখনো পৌঁছয়নি, আগে তার স্বাদ গ্রহণ করেনি। আসলে দ্বিতীয় ভাষার সন্ধান হল সেই 'অতলে' নামার সাহস। সেই অতলে নামার সাহস নিকানোর পারুরার আছে, রুজেভিজের আছে, হোলুবের আছে, আছে একটু অন্যরকমভাবে অ্যালেন গীন্‌সবার্গেরও।

## কবিতার বিদেশবিভুঁই

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ধরা যাক কবিতার তর্জমা চলছে, তার ধর্মান্তর ঘটানো হচ্ছে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায়, তাকে টেনে আনা হচ্ছে এক আবহাওয়া থেকে অন্য জলবায়ুর গভীরে ; ধরা যাক মৌলিক একটি কবিতার ঘনসংহত দুটি লাইন অনূদিত হতে গিয়ে প্রসারতা পেয়ে যাচ্ছে পাঁচলাইনের বিস্তারে কিংবা একটি শব্দের ব্যঞ্জনাকে মূর্ত করতে প্রয়োজন ঘনিয়ে উঠছে গোটা একটি পঙ্‌ক্তির ; ধরা যাক, ওদেশীয় চিত্রকল্প সপ্রেক্ষিত রূপান্তরিত না হলে মাত্রা পাবে না আমাদের ঘরাণার কবিতার মেজাজে ; যা ছিল ছন্দের নির্মাণে, তাকে নিশ্ছিদ্র বাঙ্‌ময়তা না দিলে আহত হবে যাবতীয় আবেদন,—এসব সূক্ষ্ম সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে কি হবে অনুবাদকের ভূমিকা ? এসব প্রশ্ন নতুন নয়, এক ভাষার কবিতা যখন থেকে রূপান্তরিত হতে চেয়েছিল অন্যতর ভাষার নিরিখে, তখন থেকেই জেগে উঠেছিল জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা। পৃথিবীর এক প্রান্ত চেয়েছিল অন্য প্রান্তে কিভাবে গড়িয়ে যাচ্ছে কবিতার প্রবাহ, তাকে ছুঁয়ে দেখতে ; অনুবাদের গরজ এসেছিল এইভাবেই একদিন।

সময় তার নিজস্ব দাবি থেকে তৈরি করে নেয় কবিতার ভাষা, সময় বদলের সঙ্গে সে ভাষার চরিত্র হয়ত একটু পেছনে পড়েও যায়, কিংবা, মানতেই হবে, একধরনের বিবর্তন আসে পায়ে পায়ে। ছাঁচ পাল্টে যায় আড়ালে, প্রকাশ্যে। বিষ্ণু দে যখন মালার্মেকে অনুবাদ করছেন, কিংবা সুধীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রকে, অথবা বুদ্ধদেব ব্যস্ত রিলকের তর্জমায়, তখন সময় কিন্তু অনেক সরে গেছে ; ভাষা যে-দেশেরই হোক, কাল কিন্তু পড়ে গেছে অনেক পেছনে। তাঁদের স্বপক্ষে হয়ত এমন যুক্তি অগ্রাহ্য করা যাবে না যে, সত্যিকারের কবিতার ভাষা চিরকালীন, সময়াতীত। তবু একটা সংশয়ের খোঁচা থেকেই যায় মনের কোথাও ঃ যে-সময়টা পেরিয়ে এসেছি আর যে সময়ের জমির ওপর দাঁড়িয়ে ওই মালার্মে কি শেক্সপীয়র কি রিলকে মুদ্রিত রেখে গিয়েছিলেন তাঁদের উচ্চারণ, অনুবাদের আশ্রয়ে তাকে কতখানি অবিকল রাখা যাবে আজকের ভাষায় ? অত দূর অতীতে হাতড়ে বেড়াবারও দরকার নেই। শেক্সপীয়রের সনেটগুচ্ছ সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দে যে ধ্রুপদীয়ানায় আস্থা রেখে অনুবাদ করেছিলেন একদিন, একেবারে সাম্প্রত কোনো কবি কি সেভাবে বনেদি আঙ্গিকে করতে চাইবেন তাঁদের তর্জমা ? ভাষার কিছু বাঁকবদল কি অনিবার্য হয়ে উঠবে না সেখানে ? আবার যুগভাষার পাশে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে বিশেষ বয়েসেরও একটা ভাষা। যৌবনের ভাষার সঙ্গে অনেক ভিন্নতা বার্দ্ধক্য-



ভঙ্গির। জন ডান্ যে সোনালি বয়েসে শুরু করতে পেরেছিলেন তাঁর একটি কবিতার উদ্বোধনী পঙ্‌ক্তি এইভাবে, 'For Godsake hold your tongue, and let me love', যার মধ্যে রোমাঞ্চের সঙ্গে তীব্রতা জড়িয়েছিল একাকার হয়ে, তাকে অনুবাদে স্পর্শ করতে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'র পাতায়, প্রাকসত্তর পর্বে। এ খবর আজকে আর নতুন নয় কারুর কাছে। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে সম্ভবত আমাদেরও মানতে হবে, ছান্দিত তর্জমায় ও মোলায়েম শব্দশিল্পের নির্ভরতায় সে তীব্র সংরাগ অক্ষুণ্ণ থাকেনি। অনুবাদ কোথায় যেন জন্ম দিয়েছিল দুটি মাত্র নীরক্ত পঙ্‌ক্তির।

এখন আমাদের প্রবণতার পালে লেগেছে অন্যরকম হাওয়া। বিগত অতীত থেকে চোখ সরিয়ে আমরা সম্প্রতি নজর ফিরিয়েছি সমকালের দিকে, ঠিক এই মুহূর্তের অবস্থানে থেকে আমরা সেই কবিদের অনুবাদকর্মে লগ্ন থাকতে চাইছি যাঁরা এই সময়েই অন্য ভূখন্ডে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন কবিতার জলহাওয়ায়। আমরা জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠছি ক্রমশ দেশকাল পেরিয়ে অন্য কবিরা কবিতাচর্চায় নতুন কি দিগন্ত খুলে দিচ্ছেন, তাঁদের ভাবনা ও আঙ্গিকের কতটা সমীপবর্তী আমাদের প্রয়াস, কিভাবে বাঞ্ছিত এক বিনিময় সম্ভব করে তোলা যায় তাঁদের প্রাকরণিক পরীক্ষার সঙ্গে আমাদের। বিদেশের দিকে দৃষ্টি আগেও ছিল, এখনও আছে ; শুধু প্রান্তন থেকে দূরত্ব মুছে দিয়ে ইদানীন্তন কবিতার দিকে আমাদের ঝোঁক জেগেছে বেশি। আর খানিকটা ঔদাসীন্যে, খানিকটা আলস্যে আমরা এতদিন আমাদের পার্শ্ববর্তী প্রদেশের কবিতার দিকে তাকিয়ে দেখবার হয়ত ততটা গরজ অনুভব করিনি। এখন সে জানলাও আমরা হাট করে খুলে দিয়ে হাওয়ার চলাচল সহজ আর স্বস্তিময় করে নিতে চাইছি আমাদেরই কবিতার ঘরে। ঠিক এই মুহূর্তে ভাষা কোনো খিল এঁটে অন্য দেশ বা অন্য প্রদেশের কবিতার ঘর বন্ধ করে দেয়নি। অন্যের সংসারে উঁকি দেওয়া যে সৌজন্যবিরোধী, তা আমরা জানি, কিন্তু যে সংসার ঘর করে কবিতার মানুষজন নিয়ে সেখানে কড়া নেড়ে মাঝে-মাঝে তাদের জাগিয়ে তোলা হয়ত দুরাচার নয়। অনুবাদ হল সেই অন্যের দরজায় কড়া নাড়া, নেড়ে প্রতীক্ষায় থাকা কখন সে দরজা খুলবে আরেকজন। তবেই দুজনে দাঁড়াবে মুখোমুখি, চৌকাঠের এপার আর ওপার একই সময়ের যুগলবন্দী।

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় আনাগোনার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই অনুবাদ। কিন্তু আমাদের কি একই সঙ্গে ভেবে দেখতে হয় না মাঝে-মাঝে, শুধু ভাষান্তরে নয়, সমগ্র জীবনব্যাপী একজন কবি নিজেকেই অনুবাদ করে চলেছেন ধারাবাহিকতায় ? নিজস্ব আবেগের তর্জমা, নিজস্ব বোধের অনুবাদিত শিল্প। মাতৃভাষাভুক্ত এই আবেগ, স্বজাতীয় ভাষায় আলোকিত এই বোধ। একজন কবি যখন কবিতার ক্যানভাসে গড়ে

তোলেন প্রাত্যহিক জীবনযাপনের চলচ্ছবি, হাত বাড়িয়ে তুলে আনেন আকাশ-বাতাস-নদী-নালা-গাছগাছালির টুকরো-টাকরা, কিংবা আপন অনুভবকে যোগ্য অক্ষরে ভাষায়িত করতে চান নৈপুণ্যে, তখনও তো তিনি বস্তুত অনুবাদই করেন নিজেকে, নির্জনতায়। অনুবাদ করেন সেই আবেগকেই যা তাঁকে আক্রান্ত করেছে প্রবলভাবে ; কিন্তু করলেও তাড়িত হয়ে তার কতটা শেষ পর্যন্ত উদ্ঘাটন করতে পারেন তিনি ? পারেন কি সবটাই ? সম্ভবত নয়। পারলে জীবনের একদম চূড়ান্ত লগ্নে এবং অনেক সাফল্য প্রাপ্তির পরেও এক-একজন কবি কেন জ্ঞাপন করে যেতে চান এই সত্য ঃ 'জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতাটি লিখে উঠতে পারিনি এখনও'। আসলে নিজেরই উপলব্ধিকে শ্রেয়োতর কোনো ভাষায় যে তর্জমা করে যাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল, একটা সময় কবি অনুভব করেন সামর্থ্যের সেই বিন্দুস্পর্শ করা ছিল তার আয়ত্তের অতীত। এক হিসেবে এরজন কবি সারাজীবন শুধু নিজেকেই অক্লান্তভাবে অনুবাদ করে যান। চল্লিশের এক কবি একদিন বলতে চেয়েছিলেন ঃ 'সব কবিতাই পুনর্লিখিত কবিতা ; / সেই ঘাস, সেই আকাশ, মানুষ, নারী'। কেন এই পুনর্লিখন, আর কোন্ লেখারই বা পরে ? একবার যে কবিতা একসময়ে লিখেছিলেন, তাকেই কি আবার ফিরে লিখতে চান তিনি ? নাকি আরেক কবির উচ্চারণকে অন্যতর আদলে আবারও একবার লেখার কথা ভাবেন, একেবারে নিজস্বতায় ? কিংবা ঠিক এই সময়কার একজন কবি যখন অনুপুঙ্খ বর্হিদৃশ্যাবলীকে এইভাবে কবিতার শরীরে এনে হাজির করতে চান,

অনুবাবু, সারামুখে ঘাম !
তাহলে ঘামের ফোঁটা বসিয়ে দি এইখানে ? বসিয়ে দি মিন্টু আর
ঝুমুকে স্টেশন থেকে টা টা ?
বাস থেকে নামার পর হোঁচট বা চটিছেঁড়া ? বসাই চায়ের ভাঁড় ?
নোনতা বিস্কুটগুলো বাজে ?

তখন কি মনে হয় না নিজের ভেতরের সুপ্ত ভাবনাগুলোকেই প্রত্যক্ষ দৃশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে অনুবাদই করে চলেছেন তিনি ? —এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় নয়, আবেগ থেকে অক্ষরে।

মৌলিক কবিতাই হোক, পুনর্লিখিত কবিতাই হোক, কিংবা এদের অনুবাদ—এর পেছনে যত্ন এবং অধ্যবসায় এক জরুরি শর্ত। অনাদরে কিন্তু কোনোটির ক্ষেত্রেই সিদ্ধির সাক্ষাৎ স্বপ্নেও সম্ভব নয়। আমরা দেখেছি একটি কবিতার শুদ্ধমাত্র শিরোনাম নির্বাচনে জীবনানন্দের মত কবিও কতটা নিষ্ঠা নিয়ে, দরদ নিয়ে চিঠির পর চিঠি লিখে চলেছেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। কুণ্ঠা থেকেই যাচ্ছে, কিছুতেই মনঃপুত হচ্ছে



না আর নাম। 'সুদর্শনাকে' কিংবা 'পৃথিবী, জীবন, সময়',—এই ছিল তাঁর প্রাথমিক মনোনয়ন। পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, দ্বিতীয় নামটি বেশি অর্থবাহী। কিন্তু বিভ্রান্তির জন্য তাঁর মত আবারও বদলে যায় শেষমেষ, এবং তখন তিনি নামনির্বাচনের বিবেচনাভার অর্পণ করেন স্বয়ং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওপরই। 'মানস পৃথিবীকে', 'কালকল্লোল', 'পূর্বভূমিকা' বা 'নিরবচ্ছিন্ন' —এই চারটি নামের যে-কোনো একটি অনুমোদিত হোক,— এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। একটি কবিতায় কতখানি মগ্নতা আর আত্মস্থতা থাকলে এভাবে তার উত্তররচনা পর্বকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারেন এক কবি। কিংবা অনুবাদের ক্ষেত্রেও দেখা যাক সমচরিত্রের এক দৃষ্টান্ত। ১৯৫৬ সালে বিষ্ণু দে অনুবাদ করেছিলেন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের 'A slumber did my spirit seal', কিন্তু এরও আগে ৫০ সালে ছিল তার প্রথম খসড়া আর তখন থেকেই রূপান্তর চলছিল এর টুকটাক পরিমার্জনা। আরও তিনবার—'৬২, '৬৫, আর '৭০-এ—ঘটে চলেছিল তর্জমার হেরফের। এরপর শোনা যাক কবিপত্নীরই জবানিতে ঃ 'কবিতার অপূর্ব শেষ দুটি লাইন ঃ

Rolled round in earth's diurnal course
With rocks and stones and trees,

বিষয়ে আমায় বলেছিলেন ঃ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ লাইনটায় লিখেছেন —rocks and stones—ও দুটিতো একই! আমার ওঁকে অনেক দিনের প্রশ্ন, কেন উনি একই জিনিসের কথা দিয়েছেন, দুবার, একই লাইনে ? আমি তাই লাইনটি একটু বদল করলুম—প্রকৃতিই রইল, কিন্তু একটু তফাৎ—নিশ্চয় ওয়ার্ডস্ওয়ার্থও সমর্থন করতেন !

মর্তের আহ্নিক চক্রে ঘোরে রাত্রিদিন
সঙ্গী তার শিলা, মাটি, সমুদ্র ও বন।'

বিস্ময়ের ব্যাপার, এটাও অনুবাদের চূড়ান্ত রূপ ছিল না। ১৯৮৬-তে যখন প্রথম প্রকাশ পায় তাঁর 'তুমি রবে কি বিদেশিনী', তাতে দেখছি এই দুটি লাইন আবারও পালটেছে তাদের পোশাক ঃ 'মর্তের আহ্নিক চক্রে ঘূর্ণীতে সে লীন, / শুধু শিলা, পাথর ও গাছ সঙ্গী তার।' এর মধ্যে কতটা অক্ষত রইলেন লুসি-র কবি, আর কতটাই বা উঁকি দিয়ে যাচ্ছেন বিষ্ণু দে, সময়ের হাতে সে বিচার আমরা ছেড়ে দিয়ে শুধু এটুকুই বলি ঃ মূল কবিতা ছাড়াও অনুবাদে এই সময়বাহিত নিবিড়তা ও একাগ্র আত্মনিবেশ একটা আদর্শ নজীর হয়ে আছে আমাদের কাছে। এই এখনও। মেধা বা অলোকসামান্য প্রতিভা নয়, অনুবাদের পেছনের ইতিহাসটা হল পরিশ্রমের, মেহনতের, কণ্টার্জিত আয়াসের।

আমরা চোখ ফিরিয়েছি সেকাল থেকে সাম্প্রতিকে। বিদেশের চারদিকে, মহাদেশ আর উপমহাদেশের কবিতাকে অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের দৃষ্টি আমরা বিছিয়ে রেখেছিলাম সেই কবে থেকে। অনুবাদের ব্যাপারে বিদেশী কবিতায় আকৃষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের আন্তরিকতায় খাদ ছিল না কোনোদিনই, কিন্তু অধিকাংশ অনুবাদকই এমন কবিতায় নিয়োজিত রাখতে চেয়েছিলেন নিজেদের যে কবিতার রচনাকাল ছিল দূরে অতীতে। হয়ত তাঁরা কবিতাকে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম করে পরীক্ষিত হওয়ার সুযোগও দিয়েছিলেন এইভাবে; দেখতে আগ্রহী ছিলেন, যে কবিতার অনুবাদ হতে যাচ্ছে, তা কতটা কালোত্তীর্ণ। এতে দুটি সময়ের মধ্যে যে একটা অদৃশ্য প্রাচীর তৈরী হয়ে গিয়েছিল, তা তো আমাদের স্বীকার করে নিতেই হচ্ছে। ততদিনে কি সময়প্রবাহে কবিতার শব্দশিল্প একটুও বদলে যায়নি পাঠকের কাছে? কিংবা তার ধ্যানধারণা? আসলে তো কবিতার আত্মায় শব্দপ্রযুক্তির হেরফের ঘটে যায় প্রায় সমসবয়সী কবিদের মধ্যেই। শেক্সপীয়রের সনেট রচনার সময়টা ছিল ১৫৯২ থেকে '৯৪-এর মধ্যবর্তী বছরগুলোয়। ১৫৪টা সনেটের আলাদা করে কোনো নাম তিনি নির্বাচন করেননি; শুধুমাত্র সংখ্যাসূচক ছিল তারা। এর প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পর সুধীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়র অনুবাদে এগিয়ে আসেন। এসেই একটা ছোট্ট স্বাধীনতা নিয়ে তিনি নামকরণসমেত অনুবাদ করেন তাঁর বেশ কিছু সনেট। ছন্দগঠনে তিনি মূল প্রথাই মেনে নিয়েছিলেন এবং ধ্রুপদী বিন্যাসেই রেখেছিলেন তাঁর আস্থা। কিন্তু মনে রাখতে হবে সময়ের এই সুদীর্ঘ ব্যবধান। ১৮-সংখ্যক সনেটটি অনূদিত হচ্ছে এইভাবে, তার খণ্ডাংশ,

বসন্তদিনের সনে করিব কি তোমার তুলনা?
তুমি আরও কমনীয়, আরও স্নিগ্ধ, নম্র, সুকুমার:
কালবৈশাখীতে টুটে মাধবের বিকচ কল্পনা,
ঋতুরাজ ক্ষীণপ্রাণ, অপ্রতিষ্ঠ যৌবরাজ্য তার;
আলোকের বিলোচন কখনও বা জ্বলে রুদ্র তাপে,
কখনও সন্নত বাষ্পে হিরণ্ময় অতিশয় ম্লান;
প্রাকৃত বিকারে, কিংবা নিয়তির গূঢ় অভিশাপে,
অসংবৃত অধঃপাতে সুন্দরের অমোঘ প্রস্থান

কতখানি মূলানুসারী এ অনুবাদ, সে প্রশ্ন থাক। তবে দুটি সত্য প্রসঙ্গত স্বীকার্য হয়েই ওঠে: শেক্সপীয়র নয়, সুধীন্দ্রনাথই এখানে সচারিত্র্যে উপস্থিত, এবং



শেক্সপীয়রের এলিজাবেথীয় ভাষাভঙ্গির চাইতেও যেন এ আরেকটু প্রাচীনগন্ধী, জড়তাক্লিষ্ট হয়ে রইল। আধুনিক শ্রাব্যতায় বড় বেশি কাঠিন্যসঞ্চারী এই 'বিকচ', 'অপ্রতিষ্ঠ', 'বিলোচন', 'সন্নত' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ। 'সনে' এই অব্যয় আজ শ্রুতিকটু, এবং উদ্ধৃতির শেষ পঙ্‌ক্তির অনুপ্রাসে মূলের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকাটাই বোধহয় বাঞ্ছিত হত। কেমন ছিল আদি কবিতাটির রূপ? শুধুমাত্র অষ্টকটাই তুলছি,

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometimes too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd:
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course, untrimm'd.

একই সনেটের অনুবাদে যখন লিপ্ত হন বিষ্ণু দে, তখন তিনি ভাষাগত জড়তা ও কৃত্রিমতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন ক্রমশ, সফলও হয়েছেন নিঃসংশয়ে অনেকটাই। মোটামুটি সমকালে ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে, কিন্তু স্টাইলের মধ্যে মহিমা রেখেও যে তাকে আর একটু স্বাচ্ছন্দ্যে, সহজতম শৈলীর আশ্রয়ে প্রকাশ করা যায়, সুধীন্দ্রনাথের থেকে সম্ভবত এটা আরো ভাল করে বুঝে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। বুঝেছিলেন এটাও, সুধীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভাষার মাঝামাঝি কোনো ডিকশনে এর অনুবাদ অভিপ্রেত ছিল:

তোমার উপমা আমি দেব নাকি বসন্তের দিনে?
তুমি আরো রমণীয়, হিম-উষ্ণে আরো যে সুষম।
চৈতালির রূঢ় বায়ু হানা দেয় মাধবীবিপিনে,
বৈশাখের চুক্তিপত্রে দিনের মৌরুসী বড় কম,
থেকে থেকে আকাশের চোখ জ্বলে মহাপরাক্রমে,
এবং সুন্দর সবই সৌন্দর্য খোয়ায় কালক্রমে
দৈবে কিংবা প্রকৃতির রূপান্তরে রূপসঞ্জাহীন,
আবার কখনো দেখি স্বর্ণবর্ণ ভয়ার্ত মলিন।

বিষ্ণু দে স্বাধীনতা নিয়েছিলেন অন্যত্র, কিন্তু কোন্ ব্যাখ্যায় তা নিয়েছিলেন আমাদের কাছে বোধগম্য নয়; কারণ ১৫৪টা সনেটই যে ছন্দোরীতিতে অনুসৃত ছিল

শেক্সপীয়রের হাতে, তার বিচ্যুতি তিনি ঘটালেন কেন? পঞ্চম লাইন থেকে মিলের যে চরিত্র, তা কিন্তু মূল কবিতার লক্ষ্মণাক্রান্ত নয়। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ লাইনের মিলই বা কতটা সমর্থনীয়? এ ছাড়াও শব্দজাত কৃত্রিমতা, বাকবিন্যাসের জটিল গঠন তাও যে তিনি এড়াতে পেরেছেন, তাও হয়ত বলা যায় না। তবু সুধীন্দ্রনাথের থেকে তিনি সহজতর, হয়ত বা আধুনিকতর। 'দেব', 'হানা দেয়', 'জ্বলে', 'খোয়ায়', 'দেখি'— এই ক্রিয়াপদগুলির প্রত্যক্ষ প্রয়োগে পরিবেষণারীতি যে অনেকটাই মূর্ত, রক্ত-মাংসের ব্যঞ্জনায় জীবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছিল, সে সম্পর্কে সন্দেহ কোথায়?

৩

প্রহরের পর প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে যেতে পারে যখন প্রেরণা প্রতারিত করে কোনো কবিকে, ঠিক যেন বিন্যস্ত করে নিজের কথাটা বলে উঠতে পারছেন না কবি, অল্প দিনের জন্য হলেও খরা চলছে তাঁর মাতৃভাষার অক্ষরে, অনুর্বর ঠেকছে তাঁর কাছে যাবতীয় শব্দের সমাহার। তিনি অপেক্ষায় থাকছেন, বলবার মত কথা সঞ্চিত হবে একদিন, তারপরে সময়মত নিজের উচ্চারণে মুদ্রিত করবেন যা তিনি বলতে চেয়েছেন, মাঝখানে একটা বোবা সময়ে তিনি যে সংযমী হয়ে ছিলু লেখেননি, তা তিনি কাম্য বলে ভাবেন। লেখেননি, কিন্তু লেখার কথা আদৌ ভাবেননি কি? ইচ্ছে জাগেনি কি অন্তত দুটো সময়ের দিকে তাকিয়ে দেখার? দূর অতীতের কোনো কবির লেখার দিকে কিংবা এই সময়ের কোনো? অন্যতর ভাষায় লেখা কোনো কোনো কবিতার দিকেও? তাকিয়ে এবং সেই সঙ্গে তাঁকে পাঠ করতে করতে হয়ত তিনি খুঁজে পান তাঁর নিজের সঙ্গে সেই কবির দূরগত ঝাপসা কোনো সাযুজ্য, নিকটবর্তী কোনো প্রবণতাও হয়ত বা। আর তখনই তাঁকে টেনে আনতে চান তিনি নিজের মাতৃভাষার প্রিয় মাধ্যমটির মধ্যে। হয়ত মূল ভাষায় অজ্ঞতা আছে তাঁর, তবু তিনি ঔদাস্যে সরিয়ে রাখতে পারেন না সেই পঠিত কবিতাটিকে। অন্য ভাষার আশ্রয়ে তাকে ছুঁয়ে দেখতে সাধ জাগে, অমোঘ আকর্ষণে ভাষান্তরিত করতে চান সেই বিদেশী উচ্চারণের অধিকারীকে। আমি আগেই বলেছি, একটা সময়ে অনুবাদচর্চার ব্যাপারে বিগতযুগের কবিরা প্রাধান্য পেতেন, সময়দূরত্বটা সেখানে বিচার্যবিষয় হয়ে দাঁড়াত। আজকের কবিরা চোখ ফেলতে চান বিদেশের এই মুহূর্তের দিকে, সাম্প্রত কবিতাপ্রবণতার বিভিন্ন প্রশাখার দিকে, অনুবাদে আলিঙ্গত করে দেখতে চান সমবয়সী ভারতীয় কবিদের ভঙ্গিভাবনার নানা কৌশলকারু। মূল ভাষা জেনে নিয়ে যিনি ছুঁতে পারেন সমকালীন কোনো কবির অনুভব, মূলানুগ হতে পারেন তিনি একটু বেশি; তা না হলে তাঁকে আস্থাবান হতে হয় ইংরেজী ভাষার নির্ভরযোগ্য তর্জমায়, তারপরে তিনি সম্ভব করে তোলেন তাঁর ঈপ্সীত কবিতাটির ভাষান্তর। সেই-



সঙ্গে সৎ দায়বদ্ধতায় জেনে নিতে হয় অনূদিত কবির জীবন-পঞ্জী, তাঁর দৃষ্টিকোণ, তাঁর কবিতাভাবনার বিভিন্ন পর্যায়। অনুবাদকর্মের প্রাক্তন প্রেক্ষিত হিসেবে এরা কাজ করে উপকরণেরও।

মূল মাতৃভাষায় যখন একজন কবিতা লিখছেন তখন তিনি একক, দ্বিতীয়রহিত। সেই কবিতাকে ভাষান্তরে তর্জমা করতে পারেন একাধিক কবি, একই ভাষায় অনেকে কিংবা ভিন্ন ভাষায় অনেকজন। এক-একজনের হাতে কথা বলে ওঠে একেকরকম ভাষার আদল, হয়ত বা ভাষারই সামান্য হেরফেরে ঝলসিয়ে ওঠে ওই কবিতাটিই নতুন ব্যাখ্যার আলোয়, নতুন মাত্রার সহযোগে। ভেবে নেওয়া যাক চিলির কবি নিকানোর পারুরার একটি কবিতার অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে, তর্জমার দায়িত্বে রয়েছেন দুজন; সেই সঙ্গে এও ভেবে নিই, মূল কবিতাটি আমাদের চোখের সামনে হাজির নেই, কিন্তু আসল কবিতার আস্বাদ আমরা অনেকটাই কুড়িয়ে নিচ্ছি আমাদের মাতৃভাষার সাহচর্যে,

লেখো যা তোমাদের খুশি
যে-কায়দায় লিখতে ইচ্ছে করে তাতেই
অনেক রক্ত ব'য়ে গিয়েছে সেতুর তলা দিয়ে
এই কথাই বিশ্বাস ক'রে
যে কেবল একটা রাস্তাই ঠিক।
কবিতায় সবকিছু চলে।
একটাই শুধু শর্ত, বলাই বাহুল্য
শাদা পাতার চেয়েও উৎকৃষ্ট হ'তে হবে তোমাদের — অনু: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার একজন নবীন অনুবাদকের হাতে এর যে ভাষান্তর, তার দিকেও চোখ ফেলা যাক:

লেখো যা খুশি তোমাদের ইচ্ছা
যেভাবে পার লেখ

ব্রিজের নিচ দিয়ে অনেক রক্ত বয়ে গেছে
এগিয়ে যাও বিশ্বাসের সঙ্গে
ঐ একটা পথই সত্য।

কবিতা সবকিছু নিয়েই লেখা যায়।

কেবলমাত্র এই শর্তে সুনিশ্চিতভাবে
তোমরা উন্নতি করতে পারবে শূন্য পৃষ্ঠার উপর — অনু: সমীরণ মজুমদার

পঙ্‌ক্তিসংখ্যার বিচারে দুজনের কেউই কোনো স্বাধীনতা নেননি, নিয়েছেন কবিতাটির গঠনবিন্যাসের ব্যাপারে। একজন লিখে গেছেন টানা আটটি ছত্র পরপর ; দ্বিতীয় জনের হাতে স্পেস্ এসেছে এক-একটা পর্বের ফাঁকে। কি ছিল আদি কবিতাটির চেহারায় ? অনুবাদের পাশাপাশি সব সময় মূল কবিতাটি দেখে নেওয়া সম্ভবপর নাও হতে পারে কোনো সাধারণ পাঠকের পক্ষে। তাহলে তিনি কি জানবেন ? আদি কবিতাটিতে যদি স্পেস্ থাকে তাহলে প্রথমজন তা বিসর্জন দিচ্ছেন কেন ? কিংবা যদি না থাকে, তাহলে দ্বিতীয় অনুবাদক কি ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই নিলেন এ ব্যাপারে ? কোন্‌টা গ্রহণীয়, এ এক সমস্যা। আবার শব্দ-প্রতিশব্দ দুজনের হাতে দুভাবে জেগে উঠতেই পারে, যেমন 'খুশি'র বদলে 'ইচ্ছা', 'সেতু'-র বদলে 'ব্রিজ'। কিন্তু প্রথম অনুবাদে 'এই কথাই বিশ্বাস ক'রে / যে কেবল একটা রাস্তাই ঠিক' অল্প হলেও একটু অন্যরকমভাবে পরিবেষিত হচ্ছে দ্বিতীয় তর্জমায় : 'এগিয়ে যাও বিশ্বাসের সঙ্গে / ঐ একটা পথই সত্য।' কিংবা প্রথম অনুবাদের শেষ পঙ্‌ক্তি 'শাদা পাতার চেয়েও উৎকৃষ্ট হ'তে হবে তোমাদের' আর দ্বিতীয় অনুবাদের 'তোমরা উন্নতি করতে পারবে শূন্য পৃষ্ঠার উপর' কি ঠিক একই অর্থের বাহক ? সম্ভবত নয়। কিন্তু আমাদের বক্তব্য অন্য স্তরে : তেমন আমূল বদল না হওয়ার জন্য দুটি অনুবাদই ওজনদার, দুটি অনুবাদই আমাদের মাতৃভাষায় বিবেচিত হবে সমৃদ্ধ সংযোজন হিসেবে, এবং সেই সূত্রে এটাও নির্ধারিত হয়ে যাবে কাছাকাছি কয়েকটি দশকের মধ্যে বিদেশের একজন প্রতিষ্ঠ সমকালীন কবির কবিতা-প্রবণতার মধ্যেই বা কি বাঁক অনুসৃত হচ্ছে, প্রাকরণিক গঠনবিন্যাস তাঁকে কতটা সচেতন করে তুলছে ঠিক এই মুহূর্তে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নিকারাগুয়ার কবি এর্নেস্তো কারদেনালের কবিতা থেকে। ভাষান্তরে এখানেও নিযুক্ত আছেন দুজন। সম্পূর্ণ কবিতাটির শরীর দীর্ঘ হওয়ায় উদ্ধারযোগ্য নয়, আমরা প্রথমাংশটি নিবেদন করছি। নাম : 'মেরিলিন মনরোর জন্য প্রার্থনা।'

প্রভু
তুমি এই বালিকাকে গ্রহণ করো সারা জগৎ যাকে বলে মেরিলিন মনরো
যদিও এটা তার নাম ছিল না
( কিন্তু প্রভু তুমি তো জানো কী তার সত্যি নাম, বাপ-মা মরা
যে-মেয়ে ধর্ষিত হয়েছিলো ন-বছর বয়েসে,
যে-শপগার্ল আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলো বয়েস যখন ছিলো মাত্র ষোলো )
যে এখন যাচ্ছে তোমার উপস্থিতিতে কোনো প্রসাধন ছাড়াই



কোনো প্রেস-এজেন্ট ছাড়া
ফোটো-টোটো ছাড়াই স্বাক্ষর না-বিলিয়েই
মহাকাশের অন্ধকারের মুখোমুখি কোনো মহাকাশচারীর মতোই নিঃসঙ্গ

অনু : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এ অনুবাদ গ্রন্থস্থ হয়ে প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৮৭ সালে। এরই দ্বিতীয় তর্জমার রূপ হাতে পাচ্ছি ১৯৮৯ সালে, 'প্রতিভাস' থেকে প্রকাশিত বিশ্বকবিতার অনুবাদ সংকলন 'কবিতা থেকে কবিতা'য়। ধরে নেওয়া যেতে পারে দ্বিতীয় অনুবাদকের সামনে ছিল প্রথম তর্জমার একটি নমুনা। ছিল বলছি এই কারণেই যে এক-একটা স্থানের শব্দ-প্রয়োগে বেশ টের পাওয়া যায় আগের ব্যবহৃত শব্দকে পুনঃপ্রয়োগ না করার জন্যই বোধহয় কিছু শব্দকে পালটে ফেলা হয়েছে। বাংলা ভাষান্তরে দু-জনের হাতেই কিন্তু অপরিবর্তিত রয়েছে এর শিরোনাম,

ঈশ্বর
মেরিলিন মনরো নামের ঐ মেয়েটিকে
গ্রহণ করো বিশ্বজুড়ে
এটা অবশ্য ওর নাম নয়
( তুমি অবশ্য ) ওর আসল নাম জান ; যে-অনাথ
বালিকা ৯ বছর বয়সেই ধর্ষিতা হয়েছিল ; যে পসারিনী
১৬ বছরে করতে চেয়েছিল আত্মহনন
সে এখন একা, মেক আপ ছাড়াই
তোমার কাছে যাচ্ছে। সঙ্গে নেই ওর প্রচার সচিব
হাতে নেই ফটোগ্রাফ কিংবা কারও স্বাক্ষর
যাচ্ছে যেন এক নভোশ্চর
মহাকাশের বিরুদ্ধে পাঞ্জা কষতে
হ্যাঁ একাই

অনু : বাহারউদ্দিন

'প্রভু'র জায়গায় এসে বসেছে 'ঈশ্বর', 'বাপ-মা মরা'-র বদলে 'অনাথ', 'শপগার্ল'-কে হটিয়ে 'পসারিনী', 'আত্মহত্যা'র বদলে বেছে নেওয়া হচ্ছে 'আত্মহনন', 'প্রসাধনের' বদলে 'মেক-আপ', আবার 'প্রেস-এজেন্ট' না বলে 'প্রচারসচিব', 'ফোটো-টোটো' সরিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র 'ফটোগ্রাফ'। ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছিল বলেই হয়ত দ্বিতীয় অনুবাদককে শব্দগ্রহণে একটু বেশি সতর্ক থাকতে হয়েছিল। আবার আমার এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রান্তও হতে

পারে। আসলে ভেবে দেখলে অবশ্যম্ভাবীই ছিল এসব। 'ন-বছর' আর 'ষোলো বছর' যে দ্বিতীয় তর্জমায় সংখ্যায় বদলে দেওয়া হয়েছে, তার থেকেও মনে হয় বাহারউদ্দিনের সামনে খোলা ছিল মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত প্রথম অনুবাদের নমুনা। এটা সমালোচনার বিষয় নয়, বরং কবিতার ব্যাপারে একান্তই কাম্য। দুজনের বেলায় তো বটেই, একজন কবি যদি সময়-ব্যবধানে অনুবাদ করতেন নিজেরই কোনো কবিতা, তাহলেও কি তিনি দ্বিতীয় বৈঠকে অবিকৃত রাখতে পারতেন সেই-সেই শব্দ / শব্দবন্ধ, যা তিনি প্রয়োগ করেছিলেন প্রথমবার অনুবাদে? এটা সম্ভবও নয়, কাঙ্ক্ষিতও নয়। নিকানোর পারার দু-রকম অনুবাদে দেখেছিলাম পঙ্‌ক্তি সংখ্যা অক্ষত রেখেও দুজনে বদল ঘটিয়েছেন বিন্যাসের চেহারায়; এখানে দুজনের তর্জমায় পঙ্‌ক্তির হেরফের যেমন ঘটেছে, গঠনের মধ্যেও বদল এসেছে অনিবার্যরকম। প্রথম দৃষ্টান্তে লাইনগুলো প্রকীর্ণ হয়ে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত, দ্বিতীয় অনুবাদে বিন্যাসে সংকোচন ঘটিয়ে পঙ্‌ক্তি সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে। তবু বলব, এ-সব নয়, আসল ব্যাপার পাঠক হিসেবে আমাদের দেখতে হয় ভাষার প্রাচীর পেরিয়েও কারদেনালের কবিতা কতখানি কারদেনালেরই কবিতা হয়ে ওঠে, নিকারাগুয়ার এই কবি তর্জমার পরেও কতখানি অবিকল একজন নিকারাগুয়ার কবির কাছেই ঋণী থেকে যান শেষ পর্যন্ত। এবং তা যদি হয়, তবেই বলব অনুবাদকের হাতে সম্মানিত হল অন্যভাষার কবিতা, এদেশীয় প্রকাশমাধ্যমে আদৃত হলেন ভিনদেশী এক কবিতাব্রতী। ভাষা সেখানে দূরত্বসঞ্চারী কোনো ব্যবধান নয়, বরং সেতুর মত তা মিলিয়ে দেয় দুই দেশের কবিতার অভিমুখ।

৪

পাশাপাশি প্রদেশের এতদিনকার খিল-আঁটা কবিতার দরজাও আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে অনুবাদের আনুকূল্যে। আমরা ক্রমশ জানতে পারছি সেখানকার কবিতাচর্চা আজ এই মুহূর্তে নতুন কোন্ বিষয়ের দিগন্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে, আঙ্গিকের ভাঙচুর ঘটিয়ে নতুন কোন্ প্রকরণকে স্বাগত জানাচ্ছেন সাম্প্রতিক প্রজন্ম, কবিতাকে দিয়ে কবিতার বাইরেও করিয়ে নেওয়া হচ্ছে কোন্ কাজ অথচ সম্ভ্রমহানির প্রশ্ন থাকছে না সেখানে, কবিতা কতখানি শব্দ কুড়িয়ে নিচ্ছে একবারে ভেজা মাটি থেকে, মানুষের মুখ থেকে, অবধারিত দৈনন্দিনতা থেকে। শুধু তো এখানে নয়, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে চলেছে সমান্তরাল কবিতার এই মহাপ্রয়াস। ধরা যাক ত্রিবান্দ্রমের কবি বালচন্দ্রন লিখছেন তাঁর নিজস্ব ভাষায় আর সে ভাষায় কণামাত্র দখল নেই আমাদের। অনুবাদের জন্য তৃষ্ণার্ত না হয়ে উপায় কি? সরাসরি যদি অনূদিত হয় সে কবিতা বাংলায়, তাহলে হয়ত অনুবাদক বিশ্বস্ত থাকতে পারবেন একটু বেশি; অন্যথায় তাকে নির্ভর করতে হবে প্রাথমিকভাবে



ইংরেজির ওপর যে ভাষা তার জানা, এবং তারপর ভাষান্তরিত করতে হবে বালচন্দ্রনকে। এভাবেও তো মূলানুগ হওয়া যায়। আর তাতে ক্ষতিই বা কি? বরং বহুস্তর ক্ষতিকে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যদি বালচন্দ্রনের কবিতা সম্পর্কে আমরা একেবারেই অজ্ঞ থেকে যাই। এই যে তাঁর কবিতা, যার মধ্যে স্পষ্টতার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে রয়েছে সাংকেতিক রহস্যময়তা,—

সবচেয়ে তপ্ত হৃদয়? আমার মা।
সবচেয়ে কঠিন ব্যাকরণ? আমার বাবা।
সবচেয়ে লবণাক্ত সমুদ্র? আমার স্ত্রী।
সবচেয়ে নিঃশব্দ কান্না? আমার বোন।
সবচেয়ে অনাথ জড়? আমার ভাই।
সবচেয়ে বিকৃত মুখ? তা আমারই

অনুঃ দুর্গা দত্ত

এই যে অসামান্য ঘনবদ্ধ উচ্চারণ মন্ত্রের মত যার সংহতি, যার জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষেরই কোনো এক প্রান্তে, অনুবাদে ধরা না দিলে হয়ত আজও আমাদের কাছে অপরিচিত থাকত সে সংবাদ। অথচ ভাষান্তরে যখন তাকে কুড়িয়ে নিচ্ছি বুঝতে পারি এই কবিতাকণা একদিন বাংলা কবিতাকেও হয়ত ঋদ্ধ করার ক্ষমতা রাখবে ভাবনায় আর আঙ্গিকে।

ভোপালের মর্মান্তিক গ্যাস বিপর্যয়ের পর যখন হিন্দী কবি অশোক বাজপেয়ী রচনা করেন 'পৃথিবী'-পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছ,—যার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে সবুজের জন্য এক প্রার্থনা,—তার অনুবাদ হলে আমরা বুঝতে পারি ঐ দুর্ঘটনা ছিল একটা উপলক্ষ্য মাত্র, ভাষার ভিন্নতা সেও এক সাময়িক অন্তরায়, আসলে সেখানে বিকীর্ণ হয়েছিল চিরন্তন কবিতারই উপজীব্য; এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার জন্য যেন এক আর্তিই লুকিয়ে ছিল তাঁর সমূহ অনুভবের আড়ালে, আহ্বান ছিল আত্মস্থ করে গ্রহণ করবার। অনুবাদে তাঁর কবিতার নাম নির্বাচিত হয়েছে 'এসো'।

এসো
যেমন জলের সঙ্গে জল মিশে যায়
যেমন জ্যোৎস্না মেশে জ্যোৎস্না গহ্বরে।
যেমন আঁধার আসে আঁধারের কাছে

এসো
যেভাবে গাছেরা
বল্কল শরীরে নেয়, আমাকেও নাও সেরকম

পাকদন্ডীগুলি যেরকম
জামা পরে সবুজ ঘাসের
সেরকম আমাকেও নাও

এসো
শিকড় নামিয়ে নেয় যেভাবে আঁধার
চাঁদকে গ্রহণ করে যেরকম জল
যেভাবে সময় ডোবে অসীম সময়ে

অনু : সঞ্জীব দ্বিতিজ
মল্লিকা সেনগুপ্ত

মূল কবিতাপাঠের রোমাঞ্চে শিহরণ ছিল নিশ্চয়ই আরো অনেক গুণ, অনুবাদেও আমরা বুঝে নিতে পারি 'এসো' এই শব্দটির মধ্যে বিশেষ কী আমন্ত্রণ ছিল, 'আমাকেও নাও সেরকম' কোন্ মিনতি থেকে উঠে আসছে। যেমন জলের সঙ্গে জল মিশে যায়, এ যেন এক ভাষা মিশে যাচ্ছে অন্য ভাষার শেকড় পর্যন্ত। এই বিনিময়ের জন্যই আমাদের আতি, এক ভাষা পেরিয়ে অন্য ভাষায় হেঁটে চলার জন্যই আমাদের যাবতীয় স্বপ্নকে লালন করা, অনুবাদের রাস্তা পেরিয়ে ছুঁয়ে দেখা বহুমাত্রিক ভিন্নভাষী কবিতার বিদেশ-বিভূঁই। স্থানিক আবেদন নিয়ে কবিতা আজ সংকুচিত হয়ে নেই, আঞ্চলিকতার অপ্রসারে সীমায়িত হয়ে নেই তার অন্তর্লীন সম্ভাবনা। বাংলা কবিতা পাঠ করতে করতে আমরা যখন একই সঙ্গে তর্জমার মাধ্যমে পাঠের বিষয় করে নিই অসম কি ওড়িশা কি মহারাষ্ট্রের কবিদের, তখন আমাদের বুঝতে এতটুকু দেরি হয় না যে এই ভাষান্তরের কল্যাণেই প্রাদেশিকতার বেড়া টপকে আজ সর্বভারতীয় কবিতা আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে, দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে গেছে তার সর্বজনীনতা, যৌথ উদ্যোগে অর্জিত হয়েছে বিশ্বকবিতামৈত্রী।



## কেদারনাথ সিং ( হিন্দি )

জন্ম ১৯৩৪। উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলায়। জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি সাহিত্যের অধ্যাপক। ১৯৮০ সালে পেয়েছেন কুমারন আসান পুরস্কার। প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। চতুর্থ ও এ পর্যন্ত শেষ কাব্যগ্রন্থ 'অকাল মে সারস' অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত। অনুবাদ শুরু করেছিলেন পল এলুয়ারের কবিতা দিয়ে। কবিতা ও অনুবাদের পাশাপাশি প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি মনোযোগী।

### ছোট এক অনুরোধ

আজ সন্ধেয়
যে বাজার যাচ্ছে
তার কাছে অনুরোধ
ছোট্ট এক অনুরোধ
আজ সন্ধেয় যেন এমন না হয় যে
থলেপত্তর একপাশে রেখে
আমরা রওনা হলাম
ধানমঞ্জরীর দিকে

চাল তো জরুরী
জরুরী পুদিনা আটা ডাল নুন
কিন্তু, আজ সন্ধেয় যেন এমন না হয় যে
আমরা সোজা ওখানে পৌঁছে গেলাম
ঠিক ওইখানে
যেখানে চাল
দানা হয়ে উঠবার আগে
সন্ধান পাঁড়ায় ছটফট করছে

ঠিক হবে
যদি শুরুতেই আমরা
সামনা সামনি
কোন দোভাষী ছাড়াই
সোজাসুজি কথা বলি

## ওই সুঘ্রাণের সঙ্গে

যা রক্তের পক্ষে ভালো
ভালো মুখের পক্ষে
ঘুমের পক্ষে

কেমন হয়
যদি বাজার না আসে মাঝখানে
আর আমরা একবার
চুপিচুপি দেখা করে আসি চালের সঙ্গে
দেখা করে আসি নুনের সঙ্গে
পুদিনার সঙ্গে
কেমন হয়
একবার...শুধু একবার...

## ফলের মধ্যে স্বাদের মতো

যেরকম আকাশে তারা
জলকুম্ভী জলে
বাতাসে অক্সিজেন

পৃথিবীতে সেরকম
আমি
তুমি
হাওয়া
মৃত্যু
সরষের ফুল

যেরকম দেশলাইয়ের কাঠি
ঘরে দরজা
পিঠে ফোঁড়া
ফলে স্বাদ

সেরকম...
সেরকম...



## মাতৃভাষা

যেভাবে পিঁপড়ে ফেরে
খালবিলে
কাঠঠোকরা পাখি ফেরে
কাঠে
একে একে বায়ুযান ফিরে আসে
লাল আকাশের ডাইনে ছড়ানো
বিমানবন্দরে

ও আমার ভাষা
আমি তোমার ভিতরে ফিরি
যখন চুপ করে থেকে থেকে
ধরে যায় আমার জিভ
আমার আত্মা দুঃখী হয়ে ওঠে

## আঁকুসপুর

আঁকুসপুর
ট্রেন থামল না
প্রত্যেকবারের মতো ঘরঘরিয়ে এল
আর চলে গেল আঁকুসপুর ছেড়ে

এখানে শুধু দশটার গাড়ি থামে
এক যাত্রী বলল
দ্বিতীয় যাত্রীকে

কেন ?
আরে বাবা কেন ?
কেন তা'লে পৃথিবীতে আঁকুসপুর আছে
যখন আর থাকা গেল না
তারের ওপর বসা এক পাখি তখন
জিজ্ঞেস করল দ্বিতীয় পাখিকে

## ইন্দ্রিয়বোধ

আমি চোখ দিয়ে ভাবি
কান দিয়ে দেখে নিই আমি

আমার জিভ
এক অদ্ভুত স্বাদের সঙ্গে
চুপচাপ শুনতে থাকে
সমস্ত আওয়াজ

আমার নাক
আসন্ন সুঘ্রাণের
অপেক্ষা করতে পারে না
তাই প্রায়ই তমতমিয়ে
লাল হয়ে ওঠে

আর আমি
চুপ করে থাকি বেশীর ভাগ সময়
তাই কথা বলে শুধু আমার হাত
যখন তা
কোন দ্বিতীয় হাতের মধ্যে থাকে।

অনুবাদ : **মল্লিকা সেনগুপ্ত**



## কে. সচ্চিদানন্দন ( মালয়ালম )

জন্ম : ১৯৪৬। জীববিজ্ঞানে স্নাতক এবং ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর শিক্ষা। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : পাঁচ সূর্য (১৯৭১), আত্মগীত (১৯৭২), কবিতা (১৯৭৭), ভারতীয় রেখাচিত্র (১৯৭৮), যন্ত্রণাকাল (১৯৮১), ছুটি দীর্ঘ কবিতা (১৯৮২), গ্রীষ্মের বর্ষা (১৯৮২), সচ্চিদানন্দনের কবিতা ১৯৬৫-৮২ (১৯৮৩)। এছাড়া তাঁর একটি নাট্যসংকলন ও চারটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন লোরকা, ব্রেশট, নেরুদা, অ্যামিচাই ও ভাস্কো পোপার কবিতা। 'কবিতা আর মানুষ' প্রবন্ধ গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন কেরালা সাহিত্য অকাদেমীর সি. বি. কুমার পুরস্কার (১৯৮৩)। বর্তমানে কেরালার ইরঞ্জালকুড়ার ক্রিশ্চান কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক।

## ওয়ার্ড নম্বর পাঁচ

পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের উপর দিয়ে বিষুবরেখা গিয়েছে
এখানে বসেই রোগী দেখতে পায় হিমমণ্ডল
আর উষ্ণমণ্ডল
এই ঘরটা যেন একটা কাটা কান, এখান থেকেই
সে হাসি আর কান্নার শব্দ শুনতে পায়।
বালির পাহাড়ে চড়া অভিশপ্ত কয়েদীর মতো
দুশ্চিন্তা আর হতাশায় ক্লান্ত হতে হতে
পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের রোগীর চোখে ঘুম আসে না
হয়তো ডাক্তার বুঝতেই পারবে না
তার এই জ্বরের ওঠা-নামা

সে ঠিক যে মুহূর্তে বোধিবৃক্ষের নীচে বসে
সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণার কারণ খুঁজে ফেরে
পরমুহূর্তেই গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়
নিগ্রোটি জঙ্গলে অত্যাচার করায়
তার হৃদয়ের দক্ষিণ ভাগে আশ্রয় পায়,
ফিরিয়ে দেয় পানপাত্র, জলপাইয়ের চূড়ায়
তখন তার বাম হৃদয় দিয়ে রক্ত বয়ে যায়
স্পানী ঘাঁটিতে ফ্যাসিবাদের অত্যাচারে জর্জরিত
এখন সে মেরুপর্বতের এক গুহায় বসে
বিশ্ব-সংসারের সঙ্গে প্রেম নিবেদন করা শিখছিল
আর এখন এই অভিশপ্ত রাত্রিতে বসে

গুলি চালাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে
এখন উত্তর ভারতের কয়লা মজদুরদের সঙ্গে, কয়লা
তুলতে তুলতে পা মেলাচ্ছে মঙ্গোলিয়ান বসন্ত নৃত্যের
তালে তালে গ্রামবাসীদের সাথে
ফলে সে মাঝে মাঝে ঘেমে উঠছে

যখনই সে ছুরির ফলার উপর দিয়ে হেঁটে যায়
সে প্রশ্ন করে নিজেকে—আনন্দের রহস্য কেমন ?
সে কি কিশোর-প্রেমের বেসুরো সঙ্গীত
না, অবৈধ প্রেমের গোপন সন্তোষ
অথবা নিজের প্রতিবিম্বের ধুকপুক শুনতে
প্রিয়ার পেটে কান পেতে শোয়া
অথবা অবিরত তৃষ্ণায় আত্মদহন, যা শ্মশানেও মেটে না
অথবা ছোট ছোট স্বার্থ যাকে আদর করে মমতা বলে ডাকি
অথবা সে কি সামান্য অর্থের মিথ্যা চমক
যাকে ভুল করে ভেবেছি সমৃদ্ধি
অথবা সে কি মুহূর্তের অহংকার স্থান-কাল পাত্রের
কিংবা স্থিত প্রাজ্ঞের মতো নিস্কাম কর্মের যশ
অথবা সে কি সেই আত্মার অন্তহীন রাত্রি
যার জন্ম ও সমস্ত ইচ্ছার মৃত্যু হয়ে গেছে

সে নিজেকেই প্রশ্ন করে—আনন্দের রহস্য কেমন ?

সে কখনও ব্রহ্ম দর্শন করেনি
আত্মীয়-বন্ধুরা তাকে শুধু দুঃখই দিয়েছে

যার সঙ্গে তার প্রেম ছিল—সে অন্য কারো সঙ্গে প্রেম করত
যে তাকে ভালবেসেছিল, সে প্রেম না পেয়ে মরে গেছে
মৃতের উদ্দেশ্যে সে কাঁদল কিছুক্ষণ
তারপর বিরক্তিতে খিঁচিয়ে উঠল, যে বেঁচেছিল তার জন্য
পথ প্রদর্শক নক্ষত্র আগেই হারিয়ে গেছে
জানতে পেরে
গল্পের কাঠঠোকরার মতো



সে এখন কাঠ খুঁজছে
জাহাজ নির্মাণের জন্য যা কখনও ডুববে না
এক বৃক্ষ থেকে আর এক বৃক্ষে
লাফাতে লাফাতে
কাঠ কাটতে কাটতে সে এখন
এভাবেই কাটিয়ে দিচ্ছে

## বিভূতি ঃ পাঁচ

যখন স্বাধীনতা কল্পনার গর্ভে বিলীন হয়ে যায়
সেই মায়ের যে নিজের সন্তানকে খেয়ে ফেলেছে
বহু কণ্ঠে যে জেনেছিল
সত্তা যখন বন্দুকের গুলিতে বিলীন হয়
এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায় সত্য যে বলে
হৃদয়ে ঘন্টা বেজে ওঠে
নর্তকের হাসি বিষদাঁত লুকোয়
লেখক, শিল্পী একে অপরকে চাকু চালায়
মানুষের পেছনে, পিঠে
গির্জা, পাঠশালা, আদালত আর বিধানসভা
দেওয়াল তুলে দেয়, সত্যকে গোপন রাখতে
ঘণ্টা বেজে ওঠে
শহর আর মনে আগুন জ্বলে ওঠে
পঙ্গু কাপ্তেন বদলে নেয় তিমির সঙ্গে
সেনাপতি বন্ধ্যা জমি ছেড়ে ঢেউয়ে ভাসতে থাকে
আমি যাচ্ছি
আমি যাচ্ছি রাজকুমারের মতো বোধিবৃক্ষের কাছে
যে দুঃখ দেখেছে
লক্ষ্যের দিকে যেভাবে তীর ছুটে যায়
প্রশ্নের দিকে ছুটে যায় যেমন উত্তর
গাছের দিকে যায় পাতার মতো
সমুদ্রের দিকে যায় মাছের মতো
আমি যাচ্ছি
এখনই সেই সময়, আমি যাচ্ছি ।

## নববর্ষ

একটা কাঁপা হাত ক্যালেন্ডার বদলে দিচ্ছে
একটা রথের চাকা ঘুরছে রক্ত ছড়িয়ে

কবি নিজের কাজ অবলীলায় করেন

ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ মোমের আলোয় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে
হালকা কোমল লালসারা এখন না-কাটা কেকের সামনে

একজন আস্তিক এভাবেই নববর্ষ পালন করছে

বিমূর্ত চিত্রকরের অনুপস্থিতিতে তারিখ আর মাসের
পাঁজিকার পাতায় শুধু রঙেরই অত্যাচার
এই রুগ্ন সমাজের গলিপথে
নববর্ষ আসছে হিজড়ের বেশে
এক টাকার ময়লা নোটে অশোকের দরদী স্তম্ভ
রাস্তার বেশ্যাদের ইতিহাস শেখাচ্ছে

যন্ত্রণাক্লিষ্ট পায়ে আমি প্রবেশ করছি এই নতুন বছরে
সারারাত পায়ে পিষে আঙুরের রস বার করে
ঘুমের মধ্যে চার পেয়ালা মদ ভরেছি
একটা পেয়ালা প্রেমের জন্য যাকে দেখেছি শুধু নোংরা কাপড়ে
দ্বিতীয় পেয়ালা পূর্বপুরুষদের জন্য, তাদের পরনে উজ্জ্বল সাদা কাপড়
যারা আমাকে কঠিন সমস্যায় ঠেলে দিয়েছেন
তৃতীয় পেয়ালা বিদ্রোহের জন্য, যা ছোট ছোট হাতে পিছলে যাচ্ছে
চতুর্থ পেয়ালা আগামী উত্তরপুরুষদের জন্য, যারা এখনও স্বপ্ন দেখতে ভোলেনি

বন্ধুরা এসো, শিশুরা এসো
বাল্মীকির মতো প্রাচীন এই ভাঙা-চোরা টেবিলটা ঘিরে বসো
আমার সঙ্গে তোমরাও খাও এই সামান্য রুটি,
শব্দ আর দুঃস্বপ্নের ঘাম দিয়ে তৈরি করেছি
পান কর এই কটুরসের বুদবুদে ভরা পেয়ালা, মুক্তির
দেবতার নামে, অনন্তকাল
পান কর, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।



## সূর্যের খোঁজে অন্ধজন

'সূর্য কী রকম দেখতে ?'
অন্ধজন মিছিলের ধামসা-বাদককে প্রশ্ন করে
'ধামসার মতো'
অন্ধজন ধামসা বাজায়
যখন রাত্রে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যায়
কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে, সে ভাবে এটাই সূর্য
'সূর্য কী রকম দেখতে ?'
অন্ধজন মিছিলের মশালচীকে প্রশ্ন করে
'মশালের মতো'
অন্ধজন মশাল স্পর্শ করে
সন্ধ্যায় যখন তার গায়ে
গরম জল ঢেলে দেয়, সে ভাবে এটাই সূর্য
'সূর্য কেমন দেখতে ?'
পরের দিন অন্ধজন এক জেলেকে প্রশ্ন করে
'সমুদ্রের মতো'
অন্ধজন সমুদ্রে নামে
প্রবাল পাথরে তার হাত পুড়ে যায়
সামুদ্রিক ঘোড়া এসে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়
সে সমুদ্রে পরীদের দুর্গে থাকে
শেষকালে শেওলা আর ঝিনুকদের ছুঁড়ে ফেলে
নিস্তব্ধ তরঙ্গের উপর যখন সে শুয়ে পড়ে
সে তখন ভাবে, এখন আমি বুঝেছি সূর্য দেখতে কেমন
কিন্তু যার চোখ আছে
আমি তাকে দেখাতে পারব না

যা বুঝতে পারিনি, তা বোঝা যায়
যা অনুভবে জেনেছি, কি ভাবে তার ব্যাখ্যা করব
আজও সেই অন্ধজন, সমুদ্রের পাড়ে শুয়ে থাকে
জাহাজগুলোকে অভ্যর্থনা জানাতে।

## লুকোচুরি

চারটি শিশু লুকোচুরি খেলছে
একজন ভাঁড়ার ঘরে লুকোচ্ছে
দ্বিতীয় শিশুটি খাটিয়ার নীচে
আর যে তৃতীয়, সে ছাদের উপর
চতুর্থটি,
মৃত্যুর পিছনে।

অনুবাদ : **সমীরণ মজুমদার**

## নবকান্ত বড়ুয়া ( অসমিয়া )

জন্ম : ১৯২৬। নবকান্ত বড়ুয়া অসমের প্রথম সারির কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। শুধু কবিতাই নয়, তাঁর উপন্যাসও বিশেষভাবে আদৃত। গুয়াহাটির বিখ্যাত কটন কলেজের অধ্যাপক। 'পদ্মভূষণ' পেয়েছেন। পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

## পলিমাটি

পলাশের আগুন নিভে গেছে।
শেষ হয়ে গেছে শাল ও ছাতিয়ান বনে
চৈত্রের ঝড়ের অধিকার।
কে গোনে ঝরে পড়া স্বপ্নগুলি ?
কালাং, কপিলি আর দিজুর পাড়ে
ছড়িয়ে আছে আমার পূর্বপুরুষের অস্থি।
জংলি ফুলগুলি যেখানে মাথা তুলেছে
সেখানে নিশ্চুপ ছিল আমার ঠাকুমার হৃৎপিন্ড।

মেঘ কী বলে গেল :—দাও, আরও দাও,
শূন্য না হও যতক্ষণ ;
পথের ধারে চারাগাছ রোপন কর ; কেন, হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা কর একটি।
দুয়েকটি দীর্ঘনিশ্বাস—সেই পুণ্যবান প্রিয় পথিক
চিরকালই পথ চলছে।
চুঁইয়ে পড়া জল ধুয়ে দিক ছাদে লেগে থাকা



মাকড়সার খোলস।
আমার দেহের পলিমাটি কালাংয়ের দুই পাড়
ক্রমশ উর্বর করে দিক।

আমাদের প্রপৌত্রদের নতুন ক্ষেতের গর্তগুলিতে
আমরা আবার জেগে উঠব। আমাদের প্রস্তরীভূত দেহে
তারা খুঁজে পাবে মজাদার গল্প পালটে যাওয়া অতীতের,
যে প্রণালী ধুয়ে দেয় আমাদের স্বপ্নান্ধ গলি
সেখানেই তাদের ভবিষ্যত।

## 'আমার দেহের সঙ্গে যখন বুদ্ধের দেখা হল'

আমাদের দেহের সঙ্গে যখন বুদ্ধের দেখা হল
আমি কিছু বললাম না
তিনিও আমাকে জিগ্যেস করলেন না
কিছুই।

তিনি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ভাবলেন, তারপর
পিকনিকে একলা হয়ে যাওয়া স্কুলছাত্রের মতন
নিজের নামটি লিখতে লাগলেন
ইতিহাস নামের শ্যাওলামাখা পাথরটির বুকে।

তিনি জিগ্যেস করলে আমি যা বলতাম
সেই উত্তর....
এখন বেড়ে উঠছে ভাঙা দেয়ালের গায়ে
মাথা তোলা অশথগাছটির আঁকাবাঁকা ডালপালায় ;
কুমারী কন্যার নীল চোখে তারার মত জ্বলছে
অজানা আনন্দের হীন মুহূর্তগুলিতে ;
পুত্রের কঠোর হৃদয়ের উপর ঝরে পড়া
মার কান্নায় গলিত মোমের মত মিশে যাচ্ছে ;
কোন এক মুখের রোমশ বুকের উপর ফুটে থাকা
শিশুটির মুখের সুগন্ধে ফুলের মত পাপড়ি মেলছে !

## মাপজোক

এখন বিকেল।

চল দরজির কাছে যাই, মাপ দিতে।
মাপ দিই গলা, বুক, হাত ও বাহুর
মাপ দিই বুড়ো আঙুলের।
দিতে হবে হাতের তেলোর মাপ
এবং হৃৎপিন্ডেরও।
অন্ত্র, পিত্তাশয় ও পাকস্থলীর মাপ
এমনকি হর্মোন এবং ভালবাসার মাপও দিতে হবে।
জীবনের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ কত সব জেনে নিতে হবে
এটা, সেটা এবং অন্য অনেক জিনিসের।
শুধুই মাপ দেওয়া
সেলাই করানোর কথা এখন নয়।
এখন শুধুই মাপজোক
আমরা কেবল মাপ দিতে পারি
আমরা কেবল হিসাব নিতে পারি
আমরা লিখে রাখব যে আত্মহত্যার সংখ্যা
যথেষ্ট বেড়ে গেছে।
আমরা হিসেব দেব-একটি বক্তৃতায়
কতগুলি শব্দ আছে
আরব দেশগুলিতে কতজন প্রাক্তন বসবাস করে
শুধু হিসেব দেব।
সেলাই করানোর কথা এখন নয়।
কিন্তু ভেবে দেখ
আমাদের পর কেউ আবার নতুন করে মাপবে সবকিছু
বলবে, আমাদের মাপজোক ছিল ভুল।
নতুন করে তারা মাপ নেবে
কেবল মাপ নেবে।

কিন্তু কবে কেউ সেলাই করবে মানুষের মাপসই পোশাক ?



## স্বকল্পিত

সম্ভবত নয়, হে বন্ধু, আমি নিশ্চিত জানি যে সত্যিই আছে
একটি ছোট্ট শান্তিময় দ্বীপ—যেখানে অপেক্ষা করে
তোমার প্রেমিকা বসন্তকালকে অস্তিত্বে মিশিয়ে,
তোমাকে সেই মধুর স্বাদ দিতে
যাকে আমাদের নিশ্বাস বিষাক্ত করেনি এখনও।

আমি জানি আছে, হে বন্ধু,
মানুষের মন ও মগজের কাদা নদীকে দূষিত করেছে
সেই নদীরই কোনও বাঁকে, হ্যাঁ, কোনও বাঁকে
তোমার প্রেমের আত্মার দ্বীপটি লুকিয়ে আছে,
সেখানে তোমার প্রেমিকার বাহুর
সূর্যের ফুল ও সূর্যের নরম উত্তাপে
মিশে থাকে।
সেখানে, অল্প পোড়াগন্ধ লাগা চোখের জল
হতাশ জোকারদের দেখিয়ে দেয়
সভ্যতার সার্কাসে পৌঁছে যাবার রাস্তা।

তোমার যদি সহ্য হয়,
আমি একদিনের ছুটি নিতে পারি
আমার নরক থেকে
তোমার দ্বীপে আমি কিছুক্ষণ অতিথি হয়ে থাকব
অন্তত একটি বিকেল—
ঘুঘুপাখির ডাকে নিশ্চল এক এপ্রিলের বিকেল।
সম্ভব হলে আমি কাঁদব,
আর ফিরে এসে....ফিরে এসে....

হায়! আমাকে ফিরে আসতে হবে।

**অনুবাদ : পৌলমী সেনগুপ্ত**

## রমাকান্ত রথ ( ওড়িয়া )

জন্ম : ১৯৩৪। বর্তমানে ওড়িয়া সরকারের সহকারী প্রধান সচিব। তাঁর কবিতা সাবলীল, গীতিময় এবং প্রতীকী। 'শ্রীরাধা' তাঁর অন্যতম প্রধান কবিতা। ১৯৭৮ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৪ সালে লাভ করেন উড়িষ্যার 'সরলা' পুরস্কার।

### 'শ্রীরাধা' থেকে দুটি অংশ

১

তুমি কি দেবী ? না, তুমি দেবী নও।
এমন কোমল যেন ননীর পুতুল।
সর্বদাই জলে ভেজা তোমার দুচোখ।
কথা বলতে বলতে থেমে যাও সহসাই
যেন কত শতাব্দীর কান্না
গলায় আটকে আছে।

শোকাহত সবাই যখন চ'লে যায়, নেমে আসে অন্ধকার,
তুমি একা থাকো, সঠিক জানো না
কার মৃতদেহ তোমার চোখের জলে স্নাত হয়।
শিশুরা যেভাবে কথা বলে, সেইভাবে কথা-বলা নিজেই শেখাও
মধ্যরাতে, প্রেমিকের ফিসফিস শুনে, হেসে ওঠো
অথবা দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণিঝড়ে
দুলে ওঠো আপাদমস্তক।

রাতে কী ঘটেছে, তা শুধু তুমিই জানো
ভোরবেলা যখন তোমার মুখে চাই
নিশ্চিত বুঝতে পারি, তুমি দেবী নও
অনিদ্রায় রক্তবর্ণ তোমার দুচোখ, গালে
শুকিয়ে যাওয়া চোখের জলের দাগ,
সারারাত কথা বলার কারণে
কর্কশ তোমার কণ্ঠস্বর।

যদি দেবী হ'তে, এমনভাবে কি কাঁদতে পারতে ?



না, তুমি দেবী নও,
এমনকি যদি পৃথিবীর সব লোক
ভুলভাবে তোমার বন্দনা করে,
আমি জানি সমস্ত জীবন
দুঃখ আর ক্রোধের ভিতর দিয়েই তোমাকে যেতে হবে
বুড়ী হ'তে হবে,
তারপর কোনো একদিন আমার মতোই
তোমারও নিঃশ্বাস থেমে যাবে।

নক্ষত্রখচিত আকাশকে নতস্বীকার করাতে পারোনি কখনো,
—এসো, এসো, এই ব্যর্থতার বেদনা আমাকে মুছে নিতে দাও
মুছে নিতে দাও তোমার শরীর থেকে বহু ব্যর্থযুদ্ধের শোণিত-চিহ্ন।
দ্যাখো, আজ আর কোনো জল্লাদ আসেনি।
ফাঁসিকাঠ থেকে নেমে এসো,
নিজেকে ভোরের কুয়াশায় ঢেকে নিয়ে পোশাক বদলে নাও
লোকে যাতে ভাবে, তুমি আছো
এসো, ভয় ভুলে নেমে এসো হাসতে হাসতে, আমাদের পথে।

২

তুমি পাহাড়ের সৌরভ,
প্রতিটি ফুলের শোক,
তুমি চন্দ্রের অসহ্য উত্তাপ,
উজ্জ্বল সূর্যের শীতলতা,
তুমি আমার নিজেকে লেখা চিঠির ভাষা,
হতাশা যে হাসি থেকে জন্ম নেয়—তুমি সেই হাসি,
তুমি নিদ্রাহীন প্রতীক্ষার হাজার বছর,
সব বিদ্রোহের অন্তিম ব্যর্থতা,
তুমি আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গড়া চমৎকার এক মূর্ত্তি,
মরুভূমির সবুজ গতকাল,
ফুলে ও পাতায় তুমি বর্ষা,
মাটির পৃথিবী থেকে দূরতম গ্রহে তুমি এক আলোকিত পথ,

তুমি সেই আশ্চর্য সময় যখন অর্ধেক দিন, অর্ধেক রাত,
তুমি সমুদ্রের ক্ষণকালীন স্তব্ধতার শাশ্বত রূপ,
অসম্পূর্ণ স্বপ্নের অন্তিম সান্ত্বনা,
তুমি চমকে জেগে ওঠার এলোমেলো মুহূর্ত,
ভোরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা আকাশের অনিচ্ছুক তারা,
বিদায়মুহূর্তের না-বলা বাণী,
অশান্ত বাতাসের নির্জন কারাবাস,
তুমি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত কুয়াশার শরীর,
নদীর গভীরে ঘুমন্ত প্রতিবিম্ব,
মূল্যবান রত্নরাজির অনাবিষ্কৃত খনি,
তুমি মহাশূন্যে চাঁদের আলোর ছটা,
বিদ্যুতের অব্যক্ত কাহিনী।
প্রিয়তমা, যত বেদনা পেয়েছ আমার অপূর্ণতায়,
হাসির আড়ালে সব লুকিয়ে রেখেছ।
আমি জানি, তুমি একবার যা ফেলে গেছ,
তা আবার তোমার কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য
আমি নির্ধারিত নই।
যেভাবে তোমার বর্ণনা করেছি কিছু আগে—ঠিক সেইভাবে
তোমার অংশগুলি জুড়ো ক'রে ক'রে
তোমার সঠিক রূপ দিয়ে যাবো
—এই-ই আমার বাকি জীবনের একমাত্র কাজ।

অনুবাদ : সুজিত সরকার



## আসিফ হানাফি ( উর্দু )

আসিফ হানাফি ( জন্ম ১৯২৮)-র প্রকৃত নাম আবদুল আজীজ হানাফি। ইনি ভারতীয়। হানাফি রাজনীতি ও ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, চিত্রনাট্য লিখেছেন, আকাশবাণীর অনুষ্ঠান পরিচালনায় কাজ করেছেন। হিন্দী ও উর্দু দু'ভাষাতেই এঁর কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

### ক্ষমা প্রার্থনা

আমার কপালে কোনো প্রার্থনা চিহ্ন নেই,
আমার হাতে নেই প্রার্থনার জপমালা।
আমার অভিজ্ঞতাগুলি কোরা,
আমার ব্যাকরণ ময়লা আর অপবিত্র,
আমার চিঠি, অক্ষর—
চোখের জল, রক্ত আর আবর্জনায় মাখামাখি।
আমার আকার সুভদ্র নয়, আমার চলন ছন্নছাড়া।

কেমন করে আমি এই জিভে, হে ঈশ্বর,
তোমার নাম গাইবো ?
তোমার মদ এত পরিষ্কার, এত মিষ্টি, এত পবিত্র—
আমার গ্লাস ফাটা, বিবর্ণ আর আধোয়া !

### কবিতা ৩.১১.৬৬

আজ আমার জন্মদিন।
আমি আজ আটত্রিশ।
কি তাড়াতাড়ি সময় কেটে যায় !
আমার উনিশটা দাঁত পড়ে গেছে আর
আমার পাকস্থলী জুড়ে বসে আছেন শ্রীযুক্ত ক্যাফিন,
দুলক্ষ কাপ চায়ের তলানি।
এ যাবৎ আমি ফুঁকেছি তিরিশ লক্ষ সিগারেট—
এখন আমার রক্ত শুষছেন
শ্রীমতী নিকোটিন।

আমার মনের আলমারীতে
সাজানো রয়েছে আটশো পনেরোটা বই,

সাড়ে ছ হাজার খবরের কাগজের স্তূপ আর
মুখের নিসর্গের অজস্র ফটোগ্রাফে বোঝাই
কতো না অ্যালবাম।

একটা বউ, তিনটে বাচ্চা, ছটা, নোট বই, কয়েকজন বন্ধু
গালাগালি, দোষারোপ, মিষ্টি মিষ্টি কথা,
যশের জয়ঢাক, কুখ্যাতি,
মন, আত্মা আর হৃদয়ের একটা খোলা মাঠ
যেখানে আমার প্রশ্নেরা জন্ম নেয়!
এই আমার আটত্রিশ বছর।

যে বইগুলো তাকে পড়ে আছে তারা
আমাকে দিয়ে নিজেদের পড়িয়ে নিতে চায়,
সাদা পাতাগুলো চায় আমি লিখে তাদের ভরিয়ে দি,
কিছু ফটোগ্রাফ চায় আমার নিবিড় দৃষ্টিপাত আর
কিছু উল্টোপাল্টা কবিতা ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়
কাগজের ওপর,
সিগারেট ও চা আমার কাছে চায় আরও একটু সঙ্গসুখ,
আমার জীবন আরো একটু বাঁচতে চায়
আমার মন চায় ফেটে পড়তে,
সময় চায় বয়ে যেতে,
সবাই আমার কাছে কিছুনা কিছু চায়।

এই ঊনচল্লিশের শীতে
এও কিছু দাবী নিয়ে এসেছে,
ভাবতে ইচ্ছে হয় কোনো পাওনার তাগিদে নয়
ও নিয়ে এসেছে কিছু প্রাপ্তি-স্বীকার
অথবা নিদেনপক্ষে একটা সুরভিত খাম,
অক্সিজেন, প্রেম, কয়েকটা টিউলিপ
অথবা বন্ধুর লেখা নতুন কোনো গানের বই
অথবা আমার প্রশ্নের রক্তাক্ত উত্তর,
কিছু কেজো কিছু অকেজো নিশ্বাস,
কিছু অশ্রুত সঙ্গীত, কিছু অদেখা স্বপ্ন।



আমার শরীর শুনতে পাচ্ছে ঊনচল্লিশতম শীতের কড়ানাড়া।
চিন্তার আগুন ওম্ বজায় রাখতে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমার হাড়
আর তার সঙ্গে জড়ো করে রাখা আমার যতো কামনা আর বাসনা।
তবুও আমার খোড়ো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
তাদের ইচ্ছেমতো নাচ নেচে যেতে পারে,
আমার হৃদয় নতুন নতুন আশার রশ্মি দিয়ে
জীবন বুনেই চলেছে।

কি তাড়াতাড়ি সময় কেটে যায়!
আমি আজ আটত্রিশ।
আজ আমার জন্মদিন।

## অভ্যাস

ছাদ ফুঁড়ে সন্ধে ঢুকে পড়ে
বাড়ির ভিতরে
আমি আমার কব্জি থেকে সময় খুলে নিই
আর সেটা যত্ন করে তুলে রাখি
টেবিলের ওপর।
মুক্তি আর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে
স্মৃতি আর স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে
আমার উপলব্ধির নৌকা আমি
ভাসিয়ে দিই
অন্ধকার আর বিষণ্ণ জলের গভীরে।

সকালবেলা
আমার চিন্তার নৌকায় বয়ে
সূর্যকে নিয়ে আসি আমি এইখানে।
তখন আমার কব্জিতে
আবার গলিয়ে দিই সময়ের হাতকড়া, আর
সন্ধে অবধি চালিয়ে যাই
আমার অপছন্দের নিত্যকর্ম।

অনুবাদ : অরণি বসু

## হাবিব জালিব ( পাকিস্তান )

হাবিব জালিব (জন্ম ১৯২৯) পাকিস্তানের জনপ্রিয় কবিদের একজন। বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে এঁর জনপ্রিয়তা অপরিসীম। খুব সহজ ভাষায়, একেবারে সাধারণ মানুষের মতো করে হাবিব কবিতা রচনা করেন। হাবিবের কবিতায় শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থাকে। ইনি নিজেকে রাজনৈতিক ও তাৎক্ষণিক পদ্যলেখক বলতে দ্বিধা করেন না।

### আমার মেয়ে

সে ভেবেছিলো এটা একটা খেলনা
তাই আমার হাতের শেকল দেখে
সে লাফিয়ে উঠেছিলো আনন্দে।

তার হাসি সেই সকালের মহার্ঘ উপহার।
তার হাসির মধ্যে খুঁজে পাই অমিত সাহস,
আগামী কালের মুক্ত দুনিয়ার জীবন্ত সংকেত,
আমার কালো রাত্রিগুলির উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

### কবিতার বই বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরে

আমার হাতে পেন আর
বুকের গভীরে সচেতন আলো
কোনোদিন কি তোমার শোষণ
আমাকে মিশিয়ে দিতে পারবে ধুলোয় !

আমি যখন ভাবছি সারা দুনিয়ার শান্তি নিয়ে
তখন তোমার চিন্তা শুধু নিজের চামড়া বাঁচাবার।
এই পৃথিবীতে আমি উদিত হবো সূর্যের মতো
তুমি অস্ত যাবে বিস্মৃতির অতলে।

অনুবাদ : **অরুণি বসু**



## গোজো ইয়োশিমাসু ( জাপান )

জন্ম ১৯৩৯ সালে। যুদ্ধোত্তর জাপানের একজন প্রধান কবি, অনেকের মতে হয়তো বা শ্রেষ্ঠও। কবিতার বইয়ের সংখ্যা বারো। ১৯৭৮-এ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতা সংগ্রহ। এছাড়া কবিতা সম্পর্কিত গদ্যের বই আরো কয়েকটি। দেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন, কবিতা পড়তে আমন্ত্রণ পেয়েছেন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায়। গোজোর কবিতার পংক্তি বিন্যাস বেশ অন্যরকম, অদ্ভুত রহস্যময়; আর এসবের মধ্যে থেকে উঠে আসা যে দুটি অনিবার্যতা প্রথমেই আমাদের আচ্ছন্ন করে দেয় তার একটি : বিষাদ এবং অন্যটি : নিঃসঙ্গতা। যুদ্ধের সময়কার মর্মান্তিকতা বারেবারেই আঙুল চালিয়ে দেয় তাঁর কবিতায়, ছায়া পড়ে জঙ্গী বিমানের, ঘুরে ফিরে আসে ক্ষুধা, আশ্রয়হীনতা কিংবা বিধ্বস্ত জনপদ আর সমস্ত ছাপিয়ে জীবনের এক শান্ত অফুরন্ত জলোচ্ছ্বাস।

### শিভ, শিব

মানুষের তৈরি হৃদ পুরো পরিবারটাকে গিলে খেয়ে
এখন ঝকঝক করছে,
ওরা নিশ্চয় হেমন্তহিম পাতা ( পচা পাতা ) দুই, তিন
"হ্যালো....হ্যালো...."
বনের পিছন দিকে গ্রামের ভগবান বুদ্ধ
ঘুমিয়ে আছেন, কাঠে খোদাই ভগবান বুদ্ধ
টেলিফোন রিসিভারের গভীরে "আসুরা, আসুরা"
কোন্ দেশের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এই কণ্ঠস্বর।
"আসুরা, আসুরা"
"হ্যালো....হ্যালো...."
জন্তুজানোয়ারের কিচিরমিচির, বাঁদর ( চটপটে ),
চাঁদের বলয় ( ভাল্লুক ), হেমন্তের মৃত স্তব্ধতার
মধ্যে ভাসমান বাক্যহীন মেয়েরা।
আগুন জ্বালানো, ঘর গৃহস্থালির গন্ধ,
খড়ো চালে শীত হানা দেয়
"কান্তা, কান্তা, কান্তা...."
ল্যাভেন্ডার রঙে ছোপানো জমে ওঠা গভীরতা
একটি রোমশ ব্রহ্মাণ্ড।

পার্বত্য নারীরা যেতে যেতে
আমাকে ফিসফিস করে বলে
আসুরা....আসুরা
"হ্যালো....হ্যালো....হেল...."
হেমন্তের মৃত স্তব্ধতার মধ্যে বাতাস ধাতব শব্দে বাজে
পাহাড় আগুন জ্বালে, ঘরগৃহস্থালির গন্ধ আনে
"ওরা, ওরা, ওরা...."
"কান্তা, কান্তা, কান্তা"
আঃ
পাগল করা, ঘু ঘু ঘু করা ঘুঘু পাখি।
পাহাড় আগুন জ্বালে, কন্যারা চুল ধুতে মগ্ন।
পার্বত্য কুটিরে এসে বিশ্রাম, শিব ? শিব ?
মানুষের তৈরি হ্রদ পুরো পরিবারটাকে গিলে খেয়ে
ঝকঝক করছে, তারা হিম হয়ে যাবে
গ্রামের দেবতা পাহাড়েরই দেবতা, পাহাড়ের
দেবতা গ্রামেরই দেবতা
"তাতসুকো, তাতসুকো"
"কান্তা, কান্তা, কান্তা...."
শিগগিরই শীত আসবে, শীত আসবে।

কাঠের একটি সুন্দর জাহাজ এসে স্বপ্ন দেখবে।
হ্রদটি হ্রদের তলায় ডুবে যাচ্ছে
হ্রদটি হ্রদের তলদেশ, ডোবে
হ্রদটি হ্রদের তলদেশে ডুবছে,
হ্রদটি খেত খামার আর শস্য নিয়ে ডুবছে,
হ্রদটি বাড়িঘর নিয়ে ডুবছে,
হ্রদটি প্রচন্ড ভারী ভূমিগর্ভ রেলপথ নিয়ে ডুবছে
হ্রদটি প্রচন্ড ভারী ভূমিগর্ভ রেলপথ এখন যা মায়া
তাকে নিয়ে ডুবছে, বাড়িঘর,
হ্রদটি তেকোণা-শী ( সুকুমারী বালিকা ) ডুবছে,
হ্রদটি, পুরোনো তাতামি মাদুর ডুবছে,
তাদের দুটি বা তিনটি, হ্রদের তলদেশে,



হ্রদটি, দালানবাড়ি হচ্ছে সেই হ্রদ,
খেত এবং শস্য ডুবছে,
হ্রদটি
"হ্যালো....হেল, হেল...."
আগুন জ্বালা, বাড়ি তৈরি করা
"হ্যালো....হেল, হেল...."

আমার নাম ছিল নাগিসা। প্রাচীনকালের
শিকারীরা ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে থাকা
বন্য জন্তুদের দীপ্তিময় চোখ খুঁজে বার
করবার জন্য শিকারে যেত। আমি
সব সময় হ্রদের তীরে নজর রাখতাম।
সেই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের চোখ
জ্বলজ্বল করত....আমার এখনকার
বয়সে আমার মা বাবা দুজনেই মারা
যান, তাঁরা এখানে ডুবে আছেন। আমার
যতদূর
মনে পড়ে আমার প্রেমিকার নাম ছিল
কাগামি। আমার স্মৃতিতে সেই অংশটুকুই
শুধু দেদীপ্যমান, স্বচ্ছ আমি
ছিলাম....
আসুরা আসুরা কোন্ দেশের শব্দ।
হ্রদের তলদেশে সুন্দর কাঠের জাহাজ।
হ্রদবাসিনী পাহাড়ের মেয়েরা যেতে যেতে
ফিসফিসিয়ে বলে
"হ্যালো....হ্যালো...."
"ওরা, ওরা, ওরা"

জলের বুনন, সোনার সুতো
চাঁদ নিঃশব্দে নিচে নেমে এসেছে।
আগুনের দেশে চাঁদ নেমে এসেছে।
"কান্তা, কান্তা, কান্তা"
"ওরা, ওরা, ওরা"

"আসুরা, আসুরা...."

পাহাড়ের মেয়ে গান গায়
হ্রদের তলদেশে চাঁদ নেমে এসেছে
"হ্যালো, হ্যালো, হেল"

## ( ওয়াকাবায়াশি ইসামু ) তাঁর মুসাশিনো ঘরে

লোহার অভয়ারণ্য, গাছের জন্ম
( সাদা দরজা ! )
—যারা ঘরে ঢোকে তারা আমরা নই
যারা ঘরের বাইরে আসি তারাই আমরা—
—আমরা গাছের বেড়ে ওঠা ভোর
আমরা পড়ি রঙের ছালওঠা খসে যাওয়া পাতা—
এশিয়ার মরচে পড়া অন্ধতম অংশে
চিরকালের জন্য বন্ধ
একটি নৌকো যার কণ্ঠস্বর রক্তিম
ছায়াচ্ছন্ন দ্বীপপুঞ্জের কুকুরদল !

এই আবহমন্ডলে, একটি তরুণ কাটসুরা গাছ !

লোহা, হাড় হয়ে যাওয়া রাজা !

## একটা লাল দেয়ালের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলাম

অগস্টের ফোসকা পড়া গরম, আমার চোখে একটা
লাল দেয়াল প্রতিফলিত হচ্ছিল। লোহার সেতুটি
নদীর ওপারে পৌঁছয়নি। পুরো ওজনটা ওরা
কি করে মাপে। আমার দৃষ্টি টেনে নিল।
নদী পেরিয়ে আকাশে উঠে যাওয়া এক লাল
কুয়ো, তার গভীর অভ্যন্তরে গুঁড়ি মেরে থাকা
একটা ভাস্কর্য এখন দৌড়চ্ছে, আমি তার আলো
দেখতে পাচ্ছি।



আমি তার আলো দেখতে পাচ্ছি।

পাহাড়ের খাতে নদীটির প্রস্থ প্রায় পঞ্চাশ
মিটার। পার থেকে তিন মিটার নিচুতে নদী শয্যা ?
আমি নদীপথের একজন জরিপকারী, আমি
একজন জরিপকারী।

নদীখাতের ওপর দিয়ে বন্যা বয়ে
গিয়েছিল, সে কি কাল রাত্রে ? নাকি আরো
আগে গতকাল সকালে ? ভাঁটার জলস্রোতে
কাঁপতে থাকা বালি ও ময়লায় ঢাকা
অথচ উজ্জ্বল ঘাস আর গাছের সঙ্গে আমি
কথা বললাম।

আমি এক চালক, আমি কি একজন চালক ?
ময়াল সাপের মতো ক্রুদ্ধ ? উর্বর ? আমি
বন্যার উচ্চতা মেপে দেখলাম, যা গতকাল
রাত্রে অথবা পরশু ভোরবেলা হয়েছিল, আর
ভদ্রে, তুমি হলে এক মিটার এবং পঁচাত্তর
সেন্টিমিটার। আমার পিঠে, আমার পায়ে,
আমার জানুতে, আমার বুকে, আমার শিরদাঁড়ায়
তোমার গরম নিশ্বাস অনুভব করছি....যেন
তা নিজেকে কোষমুক্ত করছে, সে নিজের
শরীরকে তুলে ধরল, ছেড়ে আসা নদীর তীরে
সে শরীরকে রাখল।

আমি কি নদীজলে ডুবে যাওয়া মানুষের
জীবনরক্ষক ? জীবনরক্ষক ? জানি না।

আমার পাশে রয়েছে মনোরম
মাছেদের আত্মার বিশ্রামসৌধ এবং আমি
এর কণ্ঠস্বরে বিস্মিত।

কাছে গেলে আমাদের গলার স্বরও
ফিসফিসে নরম হয়ে ওঠে। এর সান্নিধ্যে
কোমলভাবে চিকমিক করা ছোট মাছ এবং
মাছের কণ্ঠস্বর শোনা যেতে থাকে। স্রোতস্বিনীর

স্বচ্ছ প্রতিমূর্তিকে আমরা কিছুক্ষণের জন্য
স্পর্শ করলাম, আঁকড়ে ধরলাম,
বালির তৈরী জিনিস ? বালির তৈরী
জিনিস ?
ঠিক সেই মুহূর্তে আমি খর্ব হয়ে গেলাম,
একটা টিলা হয়ে গেলাম, অনুচ্চ স্বর হয়ে
গেলাম, একটি সুন্দর মাছ এবং সুন্দর
মাছের গাল স্পর্শ করলাম, বালি হয়ে
গেলাম, আমি প্রবাহিত হলাম ?
ঘুরতেই দেখা গেল, দূর তটের
সেই বিশাল লাল দেয়াল এই পাড়ের দিকে
এক বা দুই মিটার ঝুঁকে পড়েছে, চকমকির
আগুন, শিখার কেশর—তার গভীরে
অনেক ব্রহ্মাণ্ড, উল্কা, ভাল্লুক এবং আমার
করতলের পাথিপাথরও লাল দেয়ালের
আকাশে লাফিয়ে উঠল।
কোজা উজান, এক রহস্যময়
জায়গা, যেখানে একটি বিরাট দেয়ালের
সুর উঁচু হয়ে উঠলো।
ছোট্ট মৎসী, ছোট মৎ
সী ওখানে ছোট্ট মাছ।
১১ই অগণ্ট।
আমি লাল দেয়ালের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলাম।

অনুবাদ : **দেবারতি মিত্র**



## ইয়ং লুইহং ( চীন )

জন্ম : ১৯৬৫। কবিতা গ্রন্থের সংখ্যা একাধিক। কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধ রচনা এবং অনুবাদেও ইনি মনোযোগী। '৮৮ সালে ভোপালে অনুষ্ঠিত কবিতা এশিয়াতে অংশগ্রহণ করতে ভারতে এসেছিলেন। থাকেন বেজিংয়ে।

### দরজা

আমি চাবিটা খুলে নিলাম
যে চাবি আমার গলা থেকে
ঝোলানো ছিল এতদিন,
কিন্তু কোথায় তাকে আমি রাখব—
আমার পকেটে,
নাকি চাবির গর্তেই তার ঠিক জায়গা ?

আমি কান পেতে আছি। আশা করছি
এক্ষুণি হয়ত কেউ কথা বলে উঠবে, বলবে :
ভেতরে এসো ! অথবা আমার পিছনের
ওই স্তব্ধ সিঁড়িতে
হয়ত এক্ষুণি বেজে উঠবে চেনা পায়ের শব্দ
আর সেও এসে দাঁড়াবে এই বন্ধ দরজার মুখোমুখি

অবশেষে আমি চাবিটা
দরজার কী-হোলে লাগালাম
ঘোরাতে লাগলাম ব্যস্ত হাতে,
ভেতরে কি যেন নড়ে উঠল
তবুও আস্তে আস্তে আমি ভেতরে এলাম।
অন্ধকার ! ওঃ কি অন্ধকার ! সুইচটা কোথায় ?

একটা দেশলাই কাঠি জ্বালালাম আমি
আর নিজেই চমকে উঠলাম সেই শব্দে
খোলা দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল
ওঃ ! সুইচটা আমাকে খুঁজে পেতেই হবে—

আলো জ্বলল।
আলোয় আলোয় ঘরের সমস্ত দেওয়ালগুলো
হয়ে উঠল আয়না
আমার প্রতিবিম্ব পড়ল চারদিকে
আমি ভয়ে পিছু হটলাম
কিন্তু চারিপাশে চেয়ে দেখলাম
আমি নিজেই কখন একটা দরজা হয়ে গেছি।

## ভাঙা গাছ

গত হেমন্তকালে
গাছ থেকে খুব ঝরে পড়ছিল পাতা
আমার হৃদয়ে ছুঁয়ে গিয়েছিল শিরশিরে শূন্যতা
ভাঙা গাছটিকে তুলে বাঁধছিল হাত
আহত হৃদয় পাচ্ছিল শুশ্রূষা
পথে দেখা হল অচেনা লোকের মত
যদিও আমার ভালোবাসাটুকু শুকিয়েছে ততদিনে
বেবাক হৃদয় ফাঁকা
আমার পা দুটি ছিনিয়ে আনল আমাকে তোমার থেকে
কেন যে এমন করেছিল সে কে জানে

বিলাপের সুরে পাখি ডাকছিল শুকনো হলুদ ঝোপে
শীতের সূর্য রোগাটে আঙুলে ছুঁয়ে যাচ্ছিল তাকে
মনে হয়েছিল, জীবন শুধুই
ঝরে যাওয়া ম্লান পাতা
কুয়াশার মত চোখদুটি গিয়ে মিলেছে কুয়াশা চোখে
দুটি হৃদয়েই ফুটে উঠেছিল ঘুমভাঙা সখ্যতা

গত হেমন্তকালে
গাছ থেকে তবু ঝরেছিল ঢের পাতা।



## মুখোমুখি

শীতের পুকুরের ঘোলাটে জলে
ঝরা পাতাগুলি ভাসছিল
যেন একরাশ বিচিত্র ঝিনুক
সুন্দর প্রকৃতিকে ঠাণ্ডা শবের মত ঢেকে রেখেছিল
কুয়াশার হিম-সাদা চাদর

ঘন কুয়াশার মধ্যে আবছা দেখা যাচ্ছিল
আমার ছোট্ট কুঁড়েঘর
আর সামনের বাগানে একা দাঁড়িয়ে
আমি তোমার কথা ভাবছিলাম ;
আমার কাছেই ছিল দরজার চাবি
যেটি তুমি আমাকে দিয়েছিলে একদিন
কিন্তু ঐ চাবি আমি কোনদিন ব্যবহার করতে পারিনি
কারণ আমি জানতাম না যে আমি ভয় পেতাম
আসলে আমি ভয় পেতাম
যদি চাবি খুলে আমি ওই ঘরে ঢুকে পড়ি,
তাহলে তক্ষুণি আমাকে মুখোমুখি হতে হবে
আর একজন অন্য তুমির সঙ্গে

অনুবাদ : শবরী ঘোষ

## ডেনিস ব্রুটাস ( জিম্বাবোয়ে )

জন্ম ১৯২৪ সালে। ইংরেজি ও আফ্রিকান ভাষা ও সাহিত্যে স্বদেশে চোদ্দ বছর শিক্ষকতা করেন। বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর ফলে তাঁর শিক্ষকতা, লেখালেখি, এমন কি জনসভায় যোগদান পর্যন্ত বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। এর ফলে ১৯৬৬ সালে তাঁকে বাধ্য হয়ে ইংলণ্ডে যেতে হয়। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আফ্রিকান সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িত জনগণের যন্ত্রণা ও প্রতিবাদ সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। ইংরেজি ভাষাতেই তিনি লেখালেখি করেন। ১৯৬২ সালে কবি হিসেবে পুরস্কৃত হন আফ্রিকায়, কিন্তু এই পুরস্কার শুধুমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ কবিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

### রক্তনদীর দিন

প্রতিবছর এমন দিনে
তাদের বুটের শব্দে কেঁপে ওঠে মাটি
গোঁগোঁ জাদুমন্ত্রে
আবার রক্তের গন্ধ ফিরে আসে
বাতাসে ক্ষুধার্তভাবে তারা সেই গন্ধ শোঁকে

অপরাধ করতে করতে
তারা হয়ে ওঠে
হিংস্র, আদিম

কিন্তু সন্ধ্যাবেলা
তপ্ত বালিতে যখন বৃষ্টি ঝ'রে পড়ে
ধুলোর মাটির গন্ধ ভেসে আসে
সর্বব্যাপী সোঁদা গন্ধ

পৃথিবীর যে কোনো স্থানেই
মাটির সুগন্ধ
একইরকম।



### আমি বৃক্ষ

বৃক্ষ আমি
জেদী, আঁকাবাঁকা
বাইরে বাতাসে
শব্দ করি সারারাত

গরীবের কুঁড়েঘরে আমি
ঢেউ-খেলানো টিনের চাল
বাতাসে কর্কশ শব্দ করি
—আমার বিষণ্ণ প্রতিবাদ

আমি সেই কণ্ঠস্বর
সারারাত যার কান্না
অবিরাম
সান্ত্বনাবিহীন

### মাইল মাইল রুক্ষ এই মাটি

মাইল মাইল রুক্ষ এই মাটি
ধূমপায়ীর কাশির মতোই বিরক্তিকর, শুকনো—
তবু এরও আছে ক্ষুধার যন্ত্রণা, দীর্ঘশ্বাস
মাইল মাইল ধূলিধূসরিত আমার পৃথিবী।

রোদ্দুরে ঝলসে যায় চোখ,
চতুর্দিকে ছড়ানো পাথর, পা রাখলে পুড়ে যায়,
বালিয়াড়িতে চাকার দাগ যেন প্যাস্টেলের কাজ
তবু আমি তোমাকেই ভালোবাসি, হে আমার দগ্ধ মাটি।

তোমার আপাতরুক্ষতার নীচে
রয়ে গেছে কোমলতা
আমার প্রেমিক-হাত
তোমার গহ্বর থেকে তুলে আনে মধু।

## ট্রেনে যেতে যেতে

মাইল মাইল যে ইস্পাতরেখা
চ'লে গেছে আমার দেশের নানা পথে
—তার ধারে ধারে
ছেঁড়া জ্যালজেলে জামা-পরা শিশুরা দাঁড়িয়ে থাকে
কন্দাকৃতি হাঁটু যেন উটপাখি
নলখাগড়ার মতো সরু সরু ঠ্যাং
তাদের ক্ষুধার্ত ফাঁকা হাতগুলি উত্তোলিত
যেন প্রার্থনায়

## মধ্যরাতে, জ্যোৎস্নায়

হে মধ্যরাত্রির আকাশ, হে দুধশাদা কোমল জ্যোৎস্না,
আমাকে গ্রহণ করো—আমার ঘুমন্ত ভালোবাসা।
দিগন্তপ্রসারী স্নিগ্ধ ওই আলো যেন প্রেমের মধুর হাসি
আলোকিত ক'রে রাখে দূরের পাহাড় আর এই সমতল ভূমি,
তোমার কম্পিত বুক স্পষ্ট দেখা যায়।

এমন কোমল স্নিগ্ধ আমি ব'সে ভাবি, নত হই,
তোমার সুগন্ধ নিই,
টের পাই কোথায় রয়েছে
তোমার গোপন আনন্দ-ঝরণা, তোমার গোপন অন্ধকার
হে পৃথিবী, এখন তোমাকে চুম্বন করতে সাধ হয়।

অনুবাদ : **সুজিত সরকার**



## গ্যাব্রিয়েল ওকারা ( নাইজেরিয়া )

জন্ম ১৯২১। জার্নালিজম পড়েছেন আমেরিকায় এবং পূর্বনাইজেরীয় সরকারের দপ্তরে কাজ করেছেন। বিচ্ছিন্নতার মুক্তির, ইতিহাসের চূড়ান্ত বিচার কী হবে এখনো জানিনা আমরা, শুধু জানি সেই সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন গ্যাব্রিয়েল এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন রিভারস্টেট সরকারের সংবাদপত্র 'দি নাইজেরিয়ান টাইড', আর সরকারী দূরদর্শন ব্যবস্থা। পঞ্চাশ দশকের শেষদিকে এবং ষাটদশকের প্রথমার্ধে তাঁর 'কালো অফিয়ুস'-এর কবিতাগুচ্ছ সবচেয়ে বেশি প্রভাবসঞ্চারী হয়েছিল। ১৯৭৮ সনে তাঁর কবিতাসংগ্রহ 'ধীবরের প্রার্থনা' প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিও ( কণ্ঠস্বর, ১৯৬৪ ) তাঁর যথেষ্ট নিরীক্ষামূলক। নাইজেরীয় শিল্পোৎসবে (১৯৫৩) পুরস্কৃত হয়েছিল তাঁর কবিতা 'নান নদীর ডাক'।

## রবিবার

পামশিশুদের অন্তর্গত ভাঙারশ্মিকে
উদয়োদ্যত সূর্য লুকোয় বেগুনীমেঘে
পাখিদের গান বিদ্ধ করছে যানবাহনের
এবং হয়ত কণ্ঠস্বরেরও আবোলতাবোল
শিশুদের আর ফেরিঅলাদের চেঁচিয়ে ওঠার
সঙ্গে মিশেছে না-বলা কথারা, যেন স্মিতহাসি
ওষ্ঠে এবং বাসনায় আঁকা : মুখোশের মতো
এই দিনটির বাস্তবকেও আড়াল করেছে
আধমরা যত প্রার্থনা নিয়ে জেগে উঠি আমি
যেন ঝরে পড়ি নিজেরই শিথিল ওষ্ঠ থেকে
যে-বিলম্বিত প্রহরী, তারই সময়ের সংকেতে

আমি জেগে উঠি অর্ধমৃত প্রার্থনা নিয়ে
মিটমিটে চোখে মাপতে চেষ্টা করছি আলোর তীক্ষ্ণ
ভালবাসা আর হৃতস্বপ্নেরা, ক্ষয়িষ্ণু আঁধারের
ক্ষয় থেকে যেন ক্রমজায়মান মৌন আলোকে দেখেছি স্তব্ধ
ঝর্ণার 'পরে হেঁটে যেতে ওই গীর্জাঘন্টা প্রার্থনালগ্নকে
জানালো, এবং পাদ্রী মঞ্চে উঠল সুগম্ভীর
বিশ্বাসময় নারীপুরুষেরা রবিবাসরীয় ঝলমলে সাজে
পোশাকের ভাঁজ নিখুঁত করছে প্রার্থনাগানে জাড্য দেওয়ার মতো

## দ্যুলোকের গান

তোমার গানে দ্যুলোক ভরে
তাই সে গানের অন্যতর সুর
আমার গান মর্তপৃথিবীরই
তাই সে গানকে ব্যর্থ হতে হয়
ব্যর্থ, তবু অন্তহীনতায়
ঝাঁপিয়ে পড়া জলের মতো সমুদ্রের দিকে
তোমার গান তারায় ভরা রাতের
স্ফটিককণা : দীপ্তি দিয়ে যাবে
এগিয়ে আসা রাতের অন্ধকারে

আমার গান মধুমে, যেন মানবহৃদয়ের
নিম্নগভীরতার
উৎস থেকে উৎসারিত, কিন্তু দ্রুতমেঘের
মতন কোনো উৎস থেকে
যদি তোমার সুরের
বিন্দু ঝরে পড়ে
তারায় ভরা রাতের ঝরা বিন্দুগুলি যদি
আমার এই দুর্বল দেহ এবং কাঁপতে থাকা
পা দু'টিকে শক্তি দিয়ে যায়

## স্বাধীনতার দিন

আজ থেকে বিশ বছর আগে
তারা বলেছিল তাদের দেবতা একচোখো, তবু
শৃঙ্খল ভাঙে, মানুষেরা জানে মানুষেরই ভাক্যাকে
আজ থেকে বিশ বছর আগে
এভাবেই যেন মানুষের সব শৃঙ্খল ভেঙেছিল
তবু চেয়ে দেখো, যেদিকে ইচ্ছে
উত্তরে আর দক্ষিণে আর পুবে পশ্চিমে
যেদিকে ইচ্ছে চোখ মেলে দেখো
সেই দেবতারা, রক্তে ডোবানো পশ্চাচারীর
মতো সুখ চায় : মানবাত্মাকে ফের
শৃঙ্খলে বাঁধে, যদিও শেকল ভেঙে গিয়েছিল কুড়ি বছরের আগে

অনুবাদ : **অমিতাভ গুপ্ত**



## মিরোস্লাভ হোলুব ( চেকোস্লোভাকিয়া )

জন্ম চেকোস্লোভাকিয়ার পিলসেন শহরে ১৯২৩ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর। চার্লস বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৩ সালে স্কুল অব মেডিসিন থেকে এম. ডি. ডিগ্রী পান। ১৯৫৮ সালে চেকোস্লোভাক একাডেমি অব সায়েন্সের ইন্‌স্টিটিউট অব মাইক্রোবায়োলজি থেকে পি. এইচ্. ডি. করেন। বর্তমানে প্রাগে 'ইন্‌স্টিটিউট ফর ক্লিনিকাল এণ্ড এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিনে' কর্মরত।

কর্মজগতে বৈজ্ঞানিকের ভূমিকা যাঁর, তাঁর অসংখ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম : - ১) দিনের কাজ ২) একিলিস এবং কচ্ছপ ৩) প্রাইমার ৪) যাও, দরোজাটা খোলো ৫) একটি সম্পূর্ণ অসংবদ্ধ জীববিদ্যা ৬) যেখানে রক্ত বইছে ৭) তথাকথিত হৃদয় ৮) ইণ্টারফারন বা থিয়েটারের মধ্যে। বিজ্ঞানসম্পর্কিত পুস্তক ও মনোগ্রাফও অজস্র লিখেছেন।

এই কবি-বৈজ্ঞানিকের কবিকৃতি সম্বন্ধে গ্রাহাম মার্টিনের মতো সমালোচকও বলেন—"অন্যেরা যেখানে আমাদের যুগের বর্ব্বরতার কথা পরোক্ষে বা ইংগিতে বলেন, নাগরিক হোলুবের মানসিকতা সেখানে সমস্ত কিছুর অকথিত অথচ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রভাবে নিমজ্জিত হয়ে আছে। তাঁর কবিতা আশ্চর্যজনকভাবে সুন্দর, প্রকৃতিস্থ, বুদ্ধিদীপ্ত, সাহসী এবং উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন।" হোলুব প্যাথলজিস্ট এবং সেইজন্যই তাঁর মানসিকতা বিশ্লেষণমূলক, বাস্তববাদী এবং বিমূর্তভাবনাবিরোধী। কবিতার গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর উক্তি—"আমার কবিতা সব সময়েই একটা আইডিয়াকে আশ্রয় করেই রচিত হয়; হতে পারে, সেই আইডিয়া কখনও কখনও আমার মানসিকতাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। আমার কবিতার লম্বা লাইনগুলি দিয়ে একটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করি আর ছোট লাইনগুলিতে চেষ্টা করি প্রচণ্ড জোর দেওয়ার।"

কিছুকাল আগে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। মধ্যপ্রদেশের 'ভারত ভবনে' কবিতাপাঠ করে গেছেন। সম্প্রতি "ইন্‌ডিয়া-সিরিজ"-এর কবিতা লিখছেন বলে জানা গেছে।

## দরোজা

যাও দরোজাটা খোলো
হয়তো বাইরে আছে একটা গাছ
কিংবা একটা কাঠ
কিংবা বাগান বা একটা যাদু-শহর

যাও দরোজাটা খোলো
হয়তো দেখবে একটা কুকুর
খুব জোর তল্লাসী চালাচ্ছে ;

কিংবা হঠাৎ একটা মানুষের মুখ
কিংবা চোখ অথবা ছবির পর ছবি।

যাও দরোজাটা খোলো
কুয়াশা থাকলেও কেটে যাবে।

হয়তো কেবল অন্ধকার টিকটিক করছে
হয়তো শূন্যগর্ভ বাতাস
হয়তো কিছুই নেই
তবু যাও, দরোজাটা খোলো।

নিদেন পক্ষে পেয়ে যাবে
এক ঝলক হাওয়া।

## পাঠক্রম

একটা গাছ প্রবেশ করলো
এবং অভিবাদন ক'রে বললো : আমি গাছ।
এক ফোঁটা কালো অশ্রুজল
আকাশ থেকে ঝরে পড়লো
বললো, 'আমি পাখি'।

একটা মাকড়সার জাল বেয়ে
ভালোবাসার মতো একটা কিছু
কাছে এলো ;
বললো, 'আমি শুভ্রতা'।

কিন্তু ব্ল্যাকবোর্ডের পাশে
ফতুয়া পরা একটা জাতীয় গণতান্ত্রিক ঘোড়া
সটান দাঁড়িয়ে
চারিদিকে কান খাড়া ক'রে
কেবল ভ্যানর ভ্যানর করতে থাকলো—
'আমি ইতিহাসের এনজিন
এবং
আমরা সবাই ভালোবাসি প্রগতি
এবং সাহস
এবং যোদ্ধার ক্রোধ।'



শ্রেণী কক্ষের নীচে
শীর্ণ রক্তের ধারা ধীরে ধীরে....
কারণ
এখানেই হত্যার মর্মন্তুদ খেলা শুরু হচ্ছে
সরলতার।

## পতঙ্গ সম্পর্কে অণুচিন্তা

প্রকৃতপক্ষে কীট পতঙ্গের গঠন তেমন সুবিধের নয়।
তাদের দৈহিক কাঠামো আরো একটু ভালো হওয়া দরকার।
আরো একটু ভালো শ্বাসতন্ত্র
কিংবা এরকম বাজে জড়ানো
কতকগুলো গিঁটের পরিবর্তে
একটু ভালো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র....
এভাবে তাদের কাঠামোর একটা উন্নতিসাধন করতে পারলে—

যে সব গুবরে পোকা মাটির নীচে থাকে
তারাও একটা সংকার সমিতি গঠন করতে পারতো ;
আরশোলারাও ব্যাংক ডাকাতি করতে পারতো
পিঁপড়েরা মহাকাশ কর্মসূচীতে
অংশগ্রহণ করতে পারতো ; কিংবা—
মাছিরা তাদের বড় বড় চোখ দিয়ে
তত্ত্বতালাশী চালাতে পারতো
হাঁ বা না
ভালো বা মন্দ
একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতো
প্রমোশন বা শাস্তি দিতেও পারতো।
পোকাদের যদি ডিডিটি বা অন্যান্য
কীটনাশক থেকে নিরাপদে রাখা যেতো
তাহলে তারা
মনুষ্যজাতির উন্নতির জন্য কিছুটা অন্তত ভাবতে পারতো ;
কারণ
মানুষের কাঠামোও খুব একটা সুবিধের নয়।

## গোজাতি সম্পর্কে অণুচিন্তা

আমরা বিশ্বাস করি,
গরুর জীবনের উদ্দেশ্যই হল একটা গরু হয়ে ওঠা।
আমরা যখন গোচারণ ভূমিতে থাকি
তখন সেটা খুব কঠিন মনে হয় না।

সমস্যাটা শুরু হয় কসাইখানার দিকে যাবার সময়।

তখন একটা অজানা ভয় আমাদের গ্রাস করে,
আমাদের পাকস্থলী, বোকা হৃদয় এবং মস্তিষ্কের শূন্য মণ্ডটি
কোনো অদৃশ্য শয়তান ছিঁড়ে খায়;
আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ মাথা ঝাঁকিয়ে
ইতঃস্তত লাথি মারতে থাকি
আমাদের প্রত্যেকের তখন নাম আলাদা আলাদা হয়ে যায়।

অথবা আমরা তখন গভীর ভাবনা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি।
যেন জীবনকে প্রত্যাখ্যান করছি;
বা এমনই তৃষ্ণীভাব অবলম্বন ক'রে আছি
বা মানসিক আঁধারে কিছু হাতড়ে বেড়াচ্ছি।
যেন আত্মসমর্পণ
যেন নিষ্ফল ক্রোধ
যেন তমসাবৃত মানসিকতা।

কুড়ুল বা হাতুড়ি থেকে পরিত্রাণের কোনো নির্দেশ
প্রাচীন জ্ঞানবৃদ্ধেরা রেখে যাননি।

সুতরাং গোজন্মের জন্য আমরা খুব দুঃখিত
কারণ পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব তুচ্ছ।
আমরা অন্য কোনো চামড়ার ভেতর ঢুকতে চাই—
ধরো মানুষের চামড়ার ভেতর।
কিন্তু এসব চিন্তা শুধু গোজাতিরই চিন্তা।

এমন কি মানুষও মাঝে মাঝে ভাবতে পারে যে....

অনুবাদ : **আনন্দ ঘোষহাজরা**



## টিয়াস (জার্মানি)

জন্ম ১৯২৫। নুর্ণবার্গে একটি কবিতাপাঠের আসরে তাঁকে আবিষ্কার করি এবং জানতে পারি তাঁর মৌল নাম মাথিয়াস হেবার। সাতষট্টি বছর বয়সের এই প্রবীণ যুবাপুরুষের কবিতায় স্বগত সুরের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে সারা জগতের আর্ত মানুষজনের সঙ্গে মমিতা। এই মিশ্রণের ফলে সব সময়েই যে তাঁর সব কবিতা উৎরে যায় সেই দাবি পোষণ করলে অসংগত হবে। কিন্তু তাঁর উত্তীর্ণ কবিতাগুলি এই অন্বয়েরই উপহার।

টিয়াস সারা বিশ্বের অসংখ্য শুশ্রূষাসংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। এরকম কিছু প্রকল্পের কাজে তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছে। লক্ষ করেছি তাঁর অঙ্গীকার আর আত্মনিবেদনের ধরন। এবং সেই সঙ্গে আহত হবার সংবেদন।

স্পেনীয় এবং রুশ ভাষায় তাঁর কবিতা রূপান্তরিত হওয়ার পর একদিন তিনি আমায় বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ্যতার মর্মে ভাবনাচিন্তা করতে অনুরোধ করলেন (দ্র. 'এমন কি একফোঁটা জানালা', জন্মাষ্টমী, ১৩৯৮)। তাঁর সংবেদী পাঠক লক্ষ করবেন, একটি প্রাচ্যমন সেখানে সক্রিয়। সুতরাং তাঁর পদাবলির নানাবিধ পাঠভেদ রচনা করতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি। এবং এই মুহূর্তে ফ্রাংকফুর্টের আসন্ন বইমেলার জন্যে আমরা বাউল কবিতার জার্মান তর্জমার যে সংকলন তৈরি করছি, ভাবছি তাঁকে সহসম্পাদক হিসেবে অন্তর্গত করা যায় কিনা। তিনি এ ব্যাপারে নিবিড় আগ্রহ দেখিয়েছেন। ফলত আশা করতে পারি, তাঁর আগামী কবিতায় বাউল কবিতার ভাবকল্প প্রবেশাধিকার পেয়ে যাবে।

## অতর্কিতে

অতর্কিতে কবে
পুরুষমানুষ তার
শক্তিসাহস ঘুলিয়ে দিল
গোঁয়ার্তুমির সঙ্গে, কী ব্যাপার!

## ছবি

তোমার সমস্ত ছবি
আমার ভিতর থেকে
তুমি যদি চাও তবে

কেড়ে নিয়ো, তবে ঐ
ফ্রেমগুলো আমারি, আর
এমন-কি পেরেকগুলো

## টেলিভিশন

দূরদর্শন
অছিসার
শিশুরা তোকে
জড়িয়ে আছে

অথবা বুঝি
ওদের তুই
নিংড়ে নিয়ে
বোকা বানালি

## যে সব জালায়ন

যে সব জাল
জল ও মাছ
নিজেদের ছাঁচে বিবিক্ত করে নেয়

যে সব জাল
যাদের আঁকশি দিয়ে
অন্তরীণ করেছে আমায়

এবং যে সব জাল
অপসৃত এবং আগামীর
টানাপোড়েনে বোনা

## ভুলে যেয়ো না

ভুলে যেয়ো না :
তোমার চুলের বৃষ্টিকণায়
প্রথম সেই বিরাট জলের দু-তিনটি কণিকা
রয়ে গেছে তোমার যতো প্রপিতামহী আদিম বর্ষণে
যার অনন্ত উৎস থেকে পান করেছিলেন

অনুবাদ : **অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত**



## ফিলিপ জাকোতে ( ফ্রান্স )

জন্ম ১৯২৫-এ। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে তাঁর খ্যাতি শীর্ষছোঁয়া। যুদ্ধোত্তর প্যারিসে অতিবাহিত হয় তাঁর কবিজীবন। পাশাপাশি চলে নোটবুক, কবিতার ওপরে প্রবন্ধ আর রিলকে চর্চা। হোল্ডারলিনের কবিতারও অনুবাদক তিনি। ১৯৫৩ থেকে '৮৩— এই সময়সীমায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সাতটি কবিতাগ্রন্থ, যার কয়েকটির নাম এইরকম : কালপেঁচা (১৯৫৩), অজ্ঞতা (১৯৫৭), পাঠক্রম (১৯৬৯), পাতালের গান (১৯৭৪), শীতের আলো (১৯৭৭) ইত্যাদি। অজস্র পুরস্কার ও সম্মানে অভিনন্দিত হয়েছেন, কবিতা সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়েছেন প্রধানতম দেশগুলোয়।

## পাতালের গান

তুমি কথা বলছ
তুমি লিখছ
ধরো, তখন খুব নরম আলো জ্বলছে চারদিকে, তোমার ঘরে
ধরো, তখন অনেক রাত
আর তুমি খুব নিরাপদে বুনে চলেছ শব্দজাল
একটুও কেঁপে না উঠে
লিখছ 'ভয়', লিখছ 'ভালোবাসা'
এইমাত্র তুমি লিখলে 'রক্ত'
রক্তাক্ত হলে না তুমি
রক্ত গড়িয়ে নামল না তোমার সাদা পাতায়

কি লিখতে বসেছিলে তুমি
কিভাবে মেলে ধরতে চেয়েছিলে জীবন
একটু পরে সব ভুলে যাবে
শব্দের খেলা তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে অতলে

চারপাশে গড়ে তুলেছ রহস্য
গড়ে তুলেছ দূরত্ব
কিন্তু সব ভেঙেচুরে একদিন আকাশ আড়াল করে দাঁড়াবে তোমার যন্ত্রণা
তার হাঁ মুখ ভয় দেখাবে তোমাকে

যন্ত্রণার শিল্পরূপে
বস্তুত, তার অপমান

২

কিছু অনুভব
যে অনুভবকে মুছে ফেলতে চায় আবহ
তার আলো ধার দেয় শব্দকে
তখন শব্দ তার আশ্রয়
তার আবেগ মোচন
এভাবেই, কবিতায় শব্দ ও অনুভবের বিবাহ হয়

শব্দ আড়াল করে মৃত্যুকে
না কি
মৃত্যুই ধারণ করে শব্দ

৩

ছায়াগুলিকে পেঁজা তুলোর মত উড়িয়ে দাও বাতাসে
এই ভবঘুরে জীবন, ভিখিরির মত তাড়া খাওয়া জীবন
উড়িয়ে দাও বাতাসে
দূরে থেকে মৃত্যুকে
কিংবা কাছ থেকে জীবনকে দেখার লজ্জা, ভয় উড়িয়ে দাও বাতাসে
মুখ তোলো আলোয়
শিকারী যেভাবে শিকারের ঘ্রাণ পায়
হাওয়ায় হাওয়ায় পা-টিপে চলো, সেভাবেই
পাহাড়ি ঝরণার মত বহে যেতে দাও জীবন

ভয়গুলিকে উড়িয়ে দিলে
তোমার ছায়াও আর ভয় দেখাবে না তোমাকে

৪

এই তো, শেষ করে আনো তোমার নতুন লেখা, তোমার নতুন কবিতার বই
যতক্ষণ না সংশয়ে
ভারি হয়ে উঠছে তোমার পাঁচপাঁচটা আঙুল
যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা তোমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অনির্দেশে

ভরে তোলো সাদা পাতা, দাও অন্ত্যমিল
যতক্ষণ না কেঁপে ওঠে মাটি



ফিরে আসে তোমার অসুখ, ভয় আর অনিশ্চয়তার ভরা সময়
তোমার আশ্রয়
যতক্ষণ না ভরে ওঠে শূন্যতায়
আর দেখো, এইসব মুহূর্তে, কোথাও কখনো, খুব পুরনো একটা গীর্জাঘর থেকে
বারবার বেজে উঠেছে ঘন্টার শব্দ
খসে পড়েছে ইঁট

তোমার উৎসর্গের পাতায় লিখো না সেই অজানা জনের নাম
যাকে কখনো চোখে দেখনি, বাতাস বয়ে এনেছে শুধু নামহীন সংকেত
বরং এসো, অক্ষরে অক্ষরে ঢেকে তোলো এই শূন্যস্থান
ঢেকে দাও আমাদের
যারা পশুর মত মাটিতে মুখ ঘষে ঘষে হেঁটে চলেছি
ঢেকে দাও, যেমন
শেষ বিকেলের রোদ
ঢেকে দেয় পাহাড়চূড়া, ঢেকে দেয় পপলার গাছগুলিকে

৫

জেগে উঠলাম আলোয়
আলো মানে আকাশ
আলো মানে রৌদ্র, যা আমার মধ্যে
সঞ্চারিত হয়ে মিলিয়ে যায় নিমেষে
আলো মানে আবেগ, যার ছায়া পড়েছে আমার কবিতায়

কালো অক্ষরগুলি-ই আসলে ছায়া
আর, আলোর ভিতর দিয়ে নিচু হয়ে আসা এই আকাশ, খুব বিস্ময়কর

কিন্তু কিভাবে বোঝাবে, আলো কাকে বলে
যখন, ঝলকে ঝলকে উড়ে আসা আলোর চেয়েও
রহস্যময়, তোমার যন্ত্রণার দিনগুলি
যখন, সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় করুণা
অন্ধকারে নক্ষত্রের মত জ্বলে থাকা তোমার চোখের জল

অনুবাদ : চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

## আন্দ্রেই ভজনেসেন্‌স্কি ( রাশিয়া )

জন্ম ১৯৩৩। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি রাশিয়ার যে কয়েকজন তরুণ প্রথাবিরুদ্ধ কবিতা লিখে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন, ভজনেসেন্‌স্কি ছিলেন তাঁদের পুরোভাগে। বিপ্লব পরবর্তী রুশ কবিতার দমবন্ধকরা পরিবেশে সেই প্রথম যেন এসে লাগল খোলামেলা বাইরের হাওয়া, দুঃসাহসী ও তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা গেল সরকারী রীতিনীতির বিরুদ্ধে ঠাট্টা ইয়ার্কি। ভজনেসেন্‌স্কি তাঁর অসামান্য কবিতাপাঠের জন্যও বিখ্যাত। ইংরেজিতে ব্যাপক পরিমাণে অনূদিত হয়েছে তাঁর কবিতা; 'অ্যান্টি-ওয়ার্ল্ডস অ্যাণ্ড দি ফিফথ্‌ এস' (১৯৬৭) এবং 'স্টোরি আন্‌ডার ফুল সেল' (১৯৭৪)-এই নামে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতার দুটি নির্বাচিত খণ্ড। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোয় এবং আমেরিকায় বহুবার আমন্ত্রিত হয়েছেন, সম্মানিত হয়েছেন নানা আন্তর্জাতিক পুরস্কারে।

### প্রথম কুয়াশা

টেলিফোন-বুথে একটা মেয়ে ঠাণ্ডায় সিঁটকিয়ে গেলো,
ছেঁড়াখোঁড়া গাত্রাবাসের মধ্যে কুঁকড়েমুকড়ে থেকে—
তার মুখ চোখের জলের ধারায় কলংকিত,
আর যেন লিপস্টিকের রং-ধরা।

দুটো ছোট আঙুলে যেন নিঃশ্বাস নেয় ও,
বরফকুচির মতো আঙুল। কানে কাচের টুকরোর মতো জল।

সমস্ত রাস্তা তাকে হেঁটে যেতে হবে এখন
বরফ-জমা রাস্তার ওপর দিয়ে।

তার চিবুকে যেন শীতের শুরু ঝিকমিক করছে—
আহত হবার এই প্রথম কুয়াশা, প্রথম কুয়াশা।

### পার্টি

উদ্যো মাতালের দল ব'সে পড়লো।
হঠাৎ....
ওরা এখন কোথায় ?
ঐ দুজন বিশেষত ?



একেবারে হাওয়া।
ওখানে নেই তো!

হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেছে কি ওদের
হাসিঠাট্টার সেই তুঙ্গমুহূর্তে—
শুধু একজোড়া খালি চেয়ার পেছনে ফেলে,
আর পড়েছিলো শুধু দুটি ছুরি ?

একটু আগেই গবগবিয়ে মদ গিলছিলো ওরা,
এখানেই ছিলো তো। পলক না ফেলতেই
ওরা উধাও—দৃষ্টিপথের বাইরে,
ওরা দুজন উধাও।

ঘোলা জমানো বরফের মধ্য দিয়ে ছুটছিলো ওরা—
ধরো না যদি ধরতে পারো,
নৌকোগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে ওরা,
চুলোয় যাক সব আইনকানুন, চুলোয় যাক বর্ষাতি
ভৃঙ্গার থেকে সমস্ত গুঞ্জন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে
যখন আঙুল টং টং ক'রে সুরাপাত্রের গায়ে শব্দ করে না,
নিজের পথ ধরেই দৌড়ে যায় নদী।
অথবা ওপরতলার একটি মেঘ যেমন।

যৌবন, তাহ'লে, তুড়ি মেরে ওড়াবেই
যা কিছু পুরনো আর যে কপিকল নিয়ে ওরা বেঁধে রাখে, তাদের
তাই এক বসন্তেই শ্যামলা কচি চারা
ঝলমলিয়ে ওঠে।

পার্টি খুব জমেছিলো কিন্তু ঃ
কিন্তু এই যুগলের যা বেপরোয়া মূর্তি,
প্রতিটি পরিত্যক্ত চেয়ারের পেছন দিকটা
আমাদের শুধু মূক, নির্বাক ক'রে রাখে।

## বাইসাইকেল

বনের ভেতরে, শিশিরে
শুয়ে আছে সাইকেল,
বার্চ-গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে দেখা যায়
রাস্তা চলেছে চিরে।

হাত-পোয়ানোর উনুন থেকে উনুনে,
যেখানে আছে পড়ে,
পেডাল থেকে পেডালে
হাতল থেকে হাতলে বর্ণে বর্ণে।

যতোই চেষ্টা করো
আমাদের গলা বুঝতে তো পারবে না
চেনে-চক্করে বাঁধা
এই সব দাঁত্য জড়োসড়ো।

ওপর দিকে তাকায়
শূন্য, আর বিশাল,
আর সেখানে—কুয়াশা এক সবুজ
কিশমিশ আর মৌমাছিতে, হায়।

ডেইজিফুল আর লজেন্স
গভীরে কলধ্বনি,
কেউ জানে না, তবুও শুয়ে আছে
ঘুমিয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে বেশ।

অনুবাদ : **প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত**



## ন্যান্সি মোরজঁন ( কিউবা )

জন্ম ১৯৪৪-এ হাভানায়। ১৯৬৭ থেকে '৮৬-এই সময়সীমার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দশটি কবিতাগ্রন্থ, যার মধ্যে বিখ্যাততমটির নাম 'যেখানে এই দ্বীপ ঘুমিয়ে আছে তার জোড়াডানা নিয়ে'। ইংরেজি, ফরাসি, ইটালিয়ান, পর্তুগীজ, জার্মান এবং রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর কবিতা। আমন্ত্রণ পেয়েছেন আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে। বর্তমানে সেণ্টার অফ ক্যারিবিয়ান স্টাডিজ'-এর উচ্চতম পদে নিযুক্ত।

## এপ্রিল

এই সব পাতা যা উড়ে যাচ্ছে আকাশের নিচে
ওরাই আমাদের জাতির চলিতভাষা

এই সব পাখি যারা নিঃশ্বাসে ছেড়ে দিচ্ছে
সংবর্তের দীর্ঘ অবসাদ

ওরা জানে এই এপ্রিল
ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রথম কামড়গুলি

ও আমার জন্মভূমি
আমি দেখছি তুমি রুদ্রবেশে দাঁড়িয়ে আছো সমুদ্রকিনারে
যে ধুলোয় আমি হাঁটছি
একদিন তা হয়ে উঠবে অপূর্ব এক গণকানন।
এবং যদি আমরা হেরেও যাই, তাহলেও
আমাদের অস্থিগুলো খাড়া হয়ে থাকবে বালিতে।

আমাদের আত্মারা এইখানে বসবাস করে
এই মাসে, অদৃষ্টপূর্ব এপ্রিলে
যেখানে এই দ্বীপ ঘুমিয়ে আছে তার জোড়াডানা নিয়ে।

## মা

আমার মায়ের কোনো উঠোন ছিল না
ছিল শুধু কতকগুলি পাথুরে দ্বীপ
যারা ভেসে বেড়াত নরম কোরালের মধ্যে
সূর্যের নিচে।

তাঁর চোখে সুঠাম কোনো প্রশাখার বিম্বন ছিল না
যা ছিল তা শুধু সংখ্যাহীন ফাঁসের।
কী ছিল সেই দিন, সেই সব দিন যখন তিনি খালিপায়ে ছুটতেন
অনাথ আশ্রমের শুভ্রতার উপর দিয়ে
এবং না হেসে
অথবা দিগন্তের দিকে না তাকিয়েই।
তাঁর ছিল না কোনো গজদন্তশোভিত শয়নকক্ষ
বেতের চেয়ারে সুসজ্জিত কোনো বসবার ঘর
না কোনো ঘষা কাঁচের ঝরোখা।
আমার মায়ের শুধু ছিল রুমাল এবং গান
যা দিয়ে তিনি আমার গভীর বিশ্বাসকে লালন করতেন
এবং নিজের মাথাকে উঁচুতে তুলে ধরতেন,
নির্বাসিতা রাজরানী—
তিনি আমাদের দিয়েছেন তাঁর হাত দুটি, মূল্যবান দুটি রত্নখন্ডের মতো
দণ্ডিত শত্রুর হিম অবশেষের সামনে।

## কফি

মা কফি নিয়ে আসেন
সাত সমুদ্রের ওপার থেকে
যেন তাঁর জীবনের গল্প
গোল হয়ে ঘিরে আছে প্রত্যেকটি ধূমবন্ধ
যা আমাদের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান।
অরুণোদয়ে বিহ্বল, তিনি হাসেন
এবং তাঁর মধুক্ষরা কেশরাশির উপর
সোনার অলংকার লাফ দিয়ে ওঠে।
তাঁর শৈশবের বিষাদ-সূত্রটি
এখনো আমাদের মধ্যে টিকে আছে।

আমরা যেন একটি অত্যুচ্চ বৃক্ষ
একটি পর্বত তরঙ্গায়িত
যার মহান ছায়ার নিচে
এক চারণকবি ঘুমিয়ে থাকতে পারে।



## বিদায়

অপরিমেয় যন্ত্রণার সেই রাস্তার উপরে
ঐখানে, শেষ বাঁকের কাছাকাছি
জামাইকার এক মানুষ আজ আশা বুনে চলেছে।
সে চায় সূর্যকে নতুন করে পেতে, নবজীবনের ধাঁচে।
তার কাজ ছিল অপরিবর্তনীয়।
মানুষটার সঙ্গে তুলনীয় শুধু পিরামিডের অজ্ঞাতনামা মিস্ত্রীরা।
সে কিংসটন শহরের ঢালগুলোকে ঝাঁট দিয়েছিল
শহরের বারান্দাগুলোকে ধুয়েছিল তার যন্ত্রণা দিয়ে
দেখেছিল পর্বতগ্রন্থি
আর বুঝেছিল যে জামাইকা হলো আসলে এক ছোট্ট দ্বীপ

কিউবার জন্যে বিরহ ? হাইতির জন্যে গৃহবিষাদ ?
না, শ্রমের যাদুকর
তোমার সহোদরা দ্বীপে তোমাকে আর অনাবাসী হতে হবে না
এই ভয়াবহ ফলন ও ধর্মঘটের জন্যে।
ফিরে চলো এবং আরো ভালো পথ খুঁড়তে থাকো
তোমার নিজের দ্বীপের জন্যে।
বল, বিদায় জামাইকা, তোমাকে বিদায়।

অনুবাদ : **দেবতোষ বসু**

## হোসে এমিলিও পাচেকো ( মেক্সিকো )

জন্ম ১৯৩৯ সালে, মেক্সিকোয়, স্পেন থেকে চলে আসা একটি সম্পন্ন পরিবারে। মেক্সিকোর এই সময়ের কবিদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনা ও সাংবাদিকতা তাঁর পেশা। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'রাতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩-তে। ১৯৬৬-তে বেরিয়েছে তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই 'বহ্নিধিরাম'। 'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না কেমন করে সময় বয়ে যায়'—এই নামে ১৯৭২-এ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নির্বাচিত কবিতার ইংরেজি অনুবাদ। তিনি 'মেহুসার রক্ত' (১৯৫৮), 'দূরের বাতাস' (১৯৬৩) ইত্যাদি উপন্যাসও লিখেছেন।

### ইতিহাসের গতি

আমি কিছু শব্দ লিখি
খানিক পরেই
ওরা অন্য কথা বলে
ওরা
অন্য এক ইচ্ছে ব্যক্ত করে
এ মুহূর্তে ওরা
কার্বন ১৪-র অনুগত
অতিদূরবর্তী কোনো মানবগোষ্ঠীর
সাংকেতিক লিপি
যারা
অন্ধকারে খোঁজে দস্তাবেজ

### পম্পাই

আগুনের ঝড় অকস্মাৎ
বেঁধে ফেলে আমাদের মৈথুনক্রিয়ায়।
লাভাস্রোতে আমরা মরিনি।
আমরা দমবন্ধ হ'য়ে মারা গেছি গ্যাসে ;
ছাই ছিল আমাদের কাফনের মত।
আমাদের দেহগুলো থেকে গেল একাত্ম, পাথরে ঃ
শিলীভূত অন্তহীন শরীরী আক্ষেপ্য।



### হেঁয়ালিদর্পণ বানরেরা

বানর যখন তোমার দিকে তাকায়
ভাবতেও কাঁপুনি লাগে
আমরা হতে পারতাম ওর
উল্টো খুদে আয়না,
ওর ভাঁড়।

### মশা

অনিদ্রার এ'দোডোবায় ওরা জন্মায়।
চটচটে ভনভনানো কালিমা।
নিরস্ত্র খুদে রক্তচোষা,
ছোট জাতের ফড়িং,
শয়তানের
বর্শাধারী অশ্বারোহী।

অনুবাদ ঃ তুষার চৌধুরী

## জুডিথ্ রড্‌রিগ্‌জ ( অস্ট্রেলিয়া )

জন্ম ১৯৩৬-এ পার্থে। প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থের সংখ্যা ছয়। এছাড়া তিনটি কবিতা সংকলন সম্পাদনা করেছেন। পেশায় ইংরেজি অধ্যাপিকা। বিভিন্ন সময়ে জামাইকা, লণ্ডন, মেলবোর্ন, সিডনি এবং পার্থের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ইনি একই সঙ্গে একজন বিখ্যাত লিনোকাট শিল্পীও। পেয়েছেন 'সাউথ অস্ট্রেলিয়ান বায়েন্নিয়াল সাহিত্য পুরস্কার' এবং 'পি. ই. এন. আন্তর্জাতিক কবিতা পুরস্কার'।

### পরিবার

আমার মায়ের পরিবারে
কেউ বেঁচে নেই সাতপুরুষে
আছে শুধু হত্যালালসার
ফাঁকে ফাঁকে দীর্ঘ নীরবতা।

আমার বাবার পরিবারে
ঐতিহ্য রয়েছে সামান্যই

জমিজমা, খ্যাতি বা ক্ষমতা
কোন কিছু ছিল না বা নেই।

আমার স্বদেশে
পিতামহ নেই আমাদের
নেই গান পুনরাবর্তিত
নৃত্য নেই। শুধু নীরবতা

সুরে থাকে, বাঁচে,
বাবা আমাদের উপকথা
জায়া-পতি, খাঁড়ির মতন
আছে মহাদেশের ভিতরে।

আমরা বাড়াই দুই বাহু
চূড়া নাড়ি, তরঙ্গকে ছুঁই
অরণ্য এবং শাদা জল
আমাদের সন্ততিরা নাচে।

## স্মৃতিভ্রম

যা কিছু আমার উত্তেজনায় মনে পড়েছে
সবই ভুল! স্মৃতির অগভীর শিকড়
অনেক কাল ধরে গেঁথে তোলা ছদ্মগুলি
সহসা আলগা করে টান দেয়—একটি বিতর্কিত
অতীত ছড়িয়ে দেয় সাম্প্রতিক ডামাডোল ঃ
ভুল ক্রিয়া-কলাপ, অমিল পংক্তি, দেশান্তর
কবন্ধ কাল, সহ-পর্যটক
এমনকি (অনুশোচনায়) বান্ধবের দল এবং জনৈক প্রেমিক।

আমি ঠোঁট কামড়াই, হাসি, ঘুরে পথে যাই। আমি বিশ্বাস করি
সেই পথের ধারণায়
যা চলে গেছে উপত্যকা আর উদ্‌ভাবনার মধ্য দিয়ে।
অনুপুঙ্খে দুর্বল, তবুও আমি আরো আমিকে পাই সঠিক—
ছিটকে সরে গিয়েও নয়, গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়েও নয়
এই জলবায়ুতে এক ধরনের সমঝোতা আর কি!

অনুবাদ ঃ **দেবতোষ বসু**



## ভার্জিনিয়া আর. টেরিস ( আমেরিকা )

জন্ম ১৯১৭। অমেরিকার প্রথম সারির মহিলা কবিদের মধ্যে ইনি একজন। ১৯৭৬-এ বেরিয়েছে তাঁর প্রথম কবিতার বই। 'আমেরিকান পোয়েট্রি রিভিউ', 'দি নেশন', 'মডার্ন পোয়েট্রি স্টাডিস', 'পোয়েট্রি নাউ' প্রভৃতি সাহিত্যপত্রে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। থাকেন নিউইয়র্কে।

## বন্য জন্তুর পায়ে চলা পথ ধরে

আমি বাড়িতে এক ধরনের কাজ শিখেছি
মেয়েদের কাজ। মা
আমাকে মেয়েদের কাজ শিখিয়েছে।
গরম রুটি কি করে বানাতে হয়।
বিপজ্জনক ছুঁচ দিয়ে কি করে সেলাই করতে হয়।
উফোঁজ্জ্বল আসবাবপত্রের ধুলো কি করে ঝাড়তে হয়।
একটি স্নেহময় বাড়িতে আমি ছিলাম এক প্রাণোচ্ছল মেয়ে।

বাইরে পিছনের দিকের কর্মশালায় অন্য বিষয়।
বাবা আমাকে শিখিয়েছে ছুতোরের কাজ।
ধাতু কাটবার লেদ চালানো। রাং-ঝালাই করা।
যখন সে সিমেন্ট ঢালত, আমি বাটাম ধরে থাকতাম।
আমি '২২ দিয়ে বুলস-আই ভেদ করতাম।
বাবা ছিল যেমন বলিষ্ঠ আমি ছিলাম তেমনি সাহসী।

কিন্তু একদিন একা পাহাড়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে
বনের প্রান্তে, বাড়িটা
অনেক দূরে একটা প্রদীপ্ত জানলা,
নীল তুষারের মধ্যে আমি দেখেছিলাম, আমার দৃষ্টিকে মধ্যপথে বাধা দিল,
মাংস শিকারে বেরুনো একটা চিতাবাঘের সদ্য চলা পথ।
আমি তাদের কোনদিন সেই চিতার পথের কথা বলি নি
তারা ছিল বাড়িতে আর আমি ছিলাম
শীতরাত্রির এপার ওপার বিস্তৃত
এক দীর্ঘ ভীতিসংকুল দেশান্তরের পথে।

## আমার বেড়ালের সঙ্গে একটি ভ্রমণ

বাতাস দরজা বন্ধ করে দিল আমাদের পিছনে।

আমরা বারান্দায় বসে লম্বা শ্বাস নিয়ে গন্ধ শুঁকছিলাম।
প্রথমটায় আমার নাক কাজ করছিল না।
আমি লক্ষ করলাম ওর মাথা এদিক ওদিক ঘুরছে।
আমি লক্ষ করলাম কিভাবে ঘ্রাণ ভিতরে ঢুকছে
তখন দেখতে পেলাম হুলোটাকে বাতাসের উজানে।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলাম
এক ধাপে এক পা,
ব্যস্তসমস্ত না হয়ে ধীরে, নিচের তলায়
পাথর, তুষারগলা ঘাস শীতল লাগছে আমাদের পায়ে।

বেড়ার উপরে একটা পাখি বসেছে।
আমরা নিচু হলাম। ছুটে গেলাম।
পাখিটা উড়ে পালাল।

যে পাখিদের ভালোবাসতাম তাদের আমি ভুলে গেছি।
আমার বেড়ালটার চোখ
একটা শ্লথগতি ডানার দিকে স্থিরলক্ষ্য।
মুমূর্ষুর ঘ্রাণের যন্ত্রণা আমি ভুলে যাই।
রক্ত আমার ঠোঁট রাঙিয়ে দিল।
বুকের হাড় পরাজয় মেনে নিল।

আমরা নরম পরিষ্কার মাটি খুঁজি
আঁচড়ে আঁচড়ে গর্ত খুঁড়ি, উবু হয়ে বসি।
চৈতী মেঘের নিচে
আকাশের তলায় পায়খানা করা বড় আরামের।

ছায়া এড়িয়ে
আমরা গরম ইঁটের উপরে গড়াই।
সূর্যের দিকে আমাদের উদর ছড়ানো
আমাদের থাবা খোলা।



আমাদের উপর দিয়ে বাতাস ছুটে যায়।

আমাদের চোখ জুড়ে আসে।
ঘুমে মাথা ঝুঁকে গিয়ে মাটিতে আমাদের নাক ঘষে যায়।

রোদ্দুরে যখন আমরা তন্দ্রাচ্ছন্ন
বেড়ালটাকে কি বলে ডাকব ভেবে পাই না।

আমাদের কোনো ভাষা নেই।

## স্বামীরা

তুমি ওদের ইগলু ছেড়ে গিয়ে
সুমেরু তুন্দ্রায় কঠোর পরিশ্রম কর।
তোমার ছায়ার পা ভরদুপুরেও বেঁটে চ্যাপটা।
সামুদ্রিক প্রাণীর চর্বি খেয়ে তোমার হজমশক্তি নষ্ট হয়েছে।
ওহ্ সুমেরুবৃত্তের উত্তরে কেন যে তুমি জন্মালে?

অতএব তুমি আফ্রিকায় গেলে।
ফল সেখানে সোনালি।
তোমার হজমশক্তির উন্নতি হল। কিন্তু
স্বপ্নে তুমি আবার ফিরে আসো বরফের চড়ায়।
তুমি বল হেল্লো। বাচ্চাদের খাওয়াবার জন্যে
যে বরফের গর্তে তুমি সীল ধর সেখানে
তোমার অস্বস্তিকর অনুভূতিগুলো ঝেড়ে ফেল।

তুমি ভুলে যাও তোমার হাঁটার একটা ধরন আছে
যা গরমদেশের অধিবাসীদের খেপিয়ে তোলে।
কখনো বা তুমি মেরুমল্লুকের ভাষার মধ্যে অনায়াসে ঢুকে পড়।
কখনো তোমার চাবুকের আঘাত তুষারশীতল।

কিন্তু ওরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। যখন তোমার কথাগুলো
টাকরায় জমে যায়
তখন সেই শীতার্ত আগুনের উত্তেজনা তোমাকে বাড়িতে স্বাগত জানায়,
আবার ডুবে যায় সুমেরু-রাত্রির মধ্যে।

অনুবাদ : মণীন্দ্র গুপ্ত

## মাক্‌সিন্‌ কুমিন ( আমেরিকা )

জন্ম ১৯২৫। এখনও অবধি কবিতাগ্রন্থের সংখ্যা ছয়। এছাড়া সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতার একটি নির্বাচিত সংকলন। যৌবনে ইনি ছিলেন একজন সাঁতারু। বর্তমানে ইংরেজির অধ্যাপনাকর্মে যুক্ত। থাকেন নিউইয়র্কে।

### প্রেমের শেষে

পরিশেষে, রফানি-পত্তি।
দেহগুলি তাদের সীমানা পুনরারম্ভে স্বস্তি।

যেমন, এই পা গুলো আমার।
তুমি ফিরিয়ে নাও হাতগুলো তোমার।

আমাদের আঙুল চামচে যত, যতেক ওষ্ঠাধর
মেনে নেয় তাদের মালিকানাধারা।

বিছানার চাদরে লুকোনো হাইগুলো, একটা দরজা
হুশ ক'রে এলোমেলোভাবে খুলে যায় আধবোজা

এবং ঠিক মাথার ওপর, একটা এয়োপ্লেন
নেমে আসছে সুরলহরীর টানে।

কিছুরই বিবর্তন নেই, শুধু
কতগুলি মুহূর্ত ছিল যখন

নেকড়েটা, কুৎসা-ছেটানো নেকড়েটা
যে সত্তার বাইরে রয়েছে দাঁড়িয়ে, সেই কাদামটে

নিঃশব্দে শুয়ে পড়ে এবং ঘুমোয়।



### একজন গৃহী মানুষ

আমরা বিছানায় শুয়ে কথা বলছি। তুমি আমাকে দেখালে ঝর্টিত আলোকচিত্রমালা।
তোমার ওয়ালেট খুলে যায় যেন তেড়ে আসা কুকুরের দিকে সেল্‌সম্যানের
ব্যাগের উৎক্ষেপনে

ফ্রেমে-বাঁধা একটা বাড়ি ঝুলছে ঝিলিমিলিঅলা
এবং নতুনভাবে বসানো হয়েছে তোমার চোখদুটো একটি শিশুর আননে।
এই যে তোমার মা খর সূর্যের নিচে বাড়ির সেই বারান্দায়।
আমরা যাকে বলতাম, কাপড়কাচার পোশাক, তিনি প'রে আছেন।
জেরানিয়ামগুচ্ছ তাদের দেহের শুদ্ধতায় প্রসারিত করে পাপড়ি
যেভাবে তোমার মাথায় তিনি সাবানজলের ধারা বইয়ে দেন
আমরা সকলেই সকলের মাদের নিয়ে মেতে আছি। কিন্তু আমার জননি মারা গেছেন।

তোমার সেলুলয়েড থেকে ধূর্ততায় জুয়াড়ীর শাগরেদের সাজানো নকশায়
ব্ল্যাক হিলে যুদ্ধের গোড়ায় তোলা একটা পুরুষহরিণের পাশে
তোমার উবু হয়ে বসা পুরোনো ছবিটা তুমি খুলে নিয়েছ।
সৈনিকের নম্বর-চাকৃতি দুলছে তোমার খোলা বুকে।
রাইফেল, ভাঙা, আড়াআড়ি পড়ে আছে তোমার দুহাঁটুর ওপর।
হত্যাকারী, যাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাসতে, তাকে আমি কী বলব,
সেই কিশোর-পুরুষটি যে ডগমগ যৌবন-উত্তাপে কুশলী ছড় ?
অ্যালবামে কোথাও যার স্থান নেই সেই আমি
অন্ধকার সকালগুলিতে জেগে থাকব তার সঙ্গে একা কেবল স্মৃতির ধারণায়।
ঝর্টিত আলোকচিত্র অবলোকনে এই পরিণতি। কিংবা যত কিছু কথাবার্তা বিছানায়।

## সম্পর্কের অন্তিমে

যার পরিসমাপ্তি হবে অ্যালবার্ট পিক হোটেলে
যেখানে শীতাতপনিয়ন্ত্রণযন্ত্র হাঁপাচ্ছে যেন কার্প মাছ
এবং স্নানঘরের কলের জলশব্দ একতারার ধ্বনির ধাঁচ
বোতল খালি, সাওয়ারম্যাশের অর্ধেক গিয়েছে চলে,

যার পরিসমাপ্তি হবে অবাধ্য বিশৃংখলায়
এই সব হাতেবোনা পাটাকা পশমের ও গাড়ির চাবির ও সব সুটকেস,
সমস্ত খোলা হাঁ করা জিনিসপত্র যা এসেছিল গতদিবায়
বর্তমানে ঠেসেঠুসে ঢুকোতে গিয়ে সব ছড়িয়ে টরিয়ে একশেষ,

একচুল মুহূর্তের স্পর্শ শেষ চুমুকের টান
মনে রেখে—কীভাবে তা প্রলম্বিত করে
রঙবিস্ফোরণ, দুটি জিহ্বার শ্যামমধুর আস্বাদে ভরে,
তারপর চাবি বন্ধ হয় হিল্টনে কিংবা শেরাটনে,
মারিঅটে বা হলিডে ইন-এ এজাতীয়
পুরুষ ও মহিলার জন্য, এইসব ঘটনা চিন্তা ক'রে।

গেলাস ভাঙা ঢের ভালো, ঢের ভালো তোয়ালেতে মুছে ফেলা, ছিঁড়ে ফেলা
ঝটিতি আলোকচিত্র, সেই পুরোনো ফাঁদে এগোনো এবং জড়িয়ে প'ড়ে
আবার কিছু মিথ্যে বলার চেয়ে, ছুঁড়ে দিয়ে মিথ্যে খেলা
ঢের ভালো হুইস্কি ঢেলে দেওয়া ডেনের গহ্বরে।

অনুবাদ : রঞ্জিত সিংহ



## লুই সিম্পসন ( আমেরিকা )

জন্ম ১৯২৩ এ, জামাইকায়। সতেরো বছর বয়সে আমেরিকায় আসেন। এখনো অবধি কবিতাগ্রন্থের সংখ্যা দশ ; যার মধ্যে কয়েকটির নাম এইরকম : 'মৃত্যুর শুভসংবাদ ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৫৫), 'গৃহশিক্ষিকার স্বপ্ন' (১৯৫৯), 'খোলা রাস্তার শেষে' (১৯৬৩), 'রাতের সেরা প্রহর' (১৯৮৩) ইত্যাদি। ১৯৬৩তে অভিনন্দিত হয়েছেন পুলিট্জার পুরস্কারে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পেয়েছেন নানা আন্তর্জাতিক সম্মান। এজরা পাউণ্ড, টি. এস. এলিয়ট এবং উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়াম-এর কবিতার ওপর তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৫-এ। পরে তাঁর আরো তিনটি গদ্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। নিউইয়র্কের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক।

## আমেরিকার কবিতা

যাই হোক না কেন, ওর থাকতে হবে
এমন একটা পাকস্থলী যা হজম করতে পারবে
রবার, বয়লা, ইউরেনিয়াম, চাঁদের টুকরোগুলো এবং কবিতা।

হাঙরের মত ওর পেটে থেকে যাবে আস্ত একটা জুতো।
আর ওকে সাঁতার কাটতে হবে মাইলের পর মাইল
মরুভূমিতে, কাতরাতে কাতরাতে
যা প্রায় মানুষের মত।

## আমেরিকার স্বপ্ন

স্বপ্নের মধ্যে আমার জীবন নেমে আসে আমার কাছে
আমার ভালোবাসাগুলো
যা ছোট ছোট হরিণের মতই সাবলীল।
অথচ আমেরিকাও স্বপ্ন দ্যাখে....
স্বপ্ন, তুমি উড়ে চলেছ রাশিয়াকে পেছনে ফেলে
স্বপ্ন, তুমি গিয়ে পড়লে এশিয়ায়।

যখন আমি চোখ নামাই রাস্তায়
রোজকার মতই আর একটা রোদ ঝকঝকে দিন, ক্যালিফোর্নিয়া
ও কার বাড়ি হয়তো আমারই পুড়ে যাচ্ছে দাউদাউ করে

আমার প্রিয় কেউ নর্দমায় শুয়ে গোঙাচ্ছে
আর মার্কিন সেনাও কাছে এসে পড়ল।

প্রতিদিন আমি জেগে উঠি অনেক দূরে গিয়ে
আমার জীবন থেকে, সে এক বিদেশে
সেখানে মানুষেরা কথা বলছে অচেনা ভাষায়
আমার খুব অদ্ভুত লাগে
আর আমার মনে হয় অদ্ভুত, এমনকি তাদের নিজেদের কাছেও।

## ভনিয়া

ওডেসা নামের শহরে
আছে এক ছোট্ট বাগান
ভনিয়া থাকে সেখানে
ভনিয়া, যাকে ভালোবাসি আমি
যদিও আমি ওডেসায় যাইনি কখনো।

আমি ভালোবাসি তার মাথার কালো চুল, তার চোখদুটো
শ্যাওলার মত সবুজ
যেন তুমি বর্ষার দিনে বেড়াতে এসেছ
শেকড় বাকড়ে ছাওয়া কোনো এক দেশে
আর তার ত্বক থেকে ফুটে উঠছে বন্য ফুলের গন্ধ।

আমরা নিজেদের বুঝতে পারি পরিপূর্ণভাবে।
ও হল আমার খুড়তুতো বোন, দূরের সম্পর্কে
বাগানের ঘাসে বসে আমরা চায়ে চুমুক দিই
আর মেতে উঠি চেকভের নাটক নিয়ে আলোচনায়
যখন সন্ধ্যে নামে আর নক্ষত্রগুলো জ্বলতে থাকে মিটমিট করে।

কিন্তু এটা শুধু একটা স্বপ্ন।
আমি নেই সেখানে
আমার শহরের বোলচাল নিয়ে
আর নেই সেই বয়স্কা মহিলাও
পর্দার আড়াল থেকে যে উঁকি মারত।



আমরা শুধুমাত্র দুটি প্রেতাত্মা, একটুকরো ছাই,
গতদিনের খবরের কাগজের মত
কিংবা যেন চিমনি থেকে উঠে যাওয়া ধোঁয়া
যা উড়ে গিয়েছিল বহুদিন আগে
ওডেসায়, কোনো এক গ্রীষ্মের রাতে।

অনুবাদ : শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

**অন্তরীপ**

সম্পাদক সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ৫ খেলাত বাবু লেন টালাপার্ক কলকাতা-৩৭
মুদ্রক সোম প্রিন্টার্স ৭ কানাইলাল চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা-৭৬
প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু চাকী

দশ টাকা